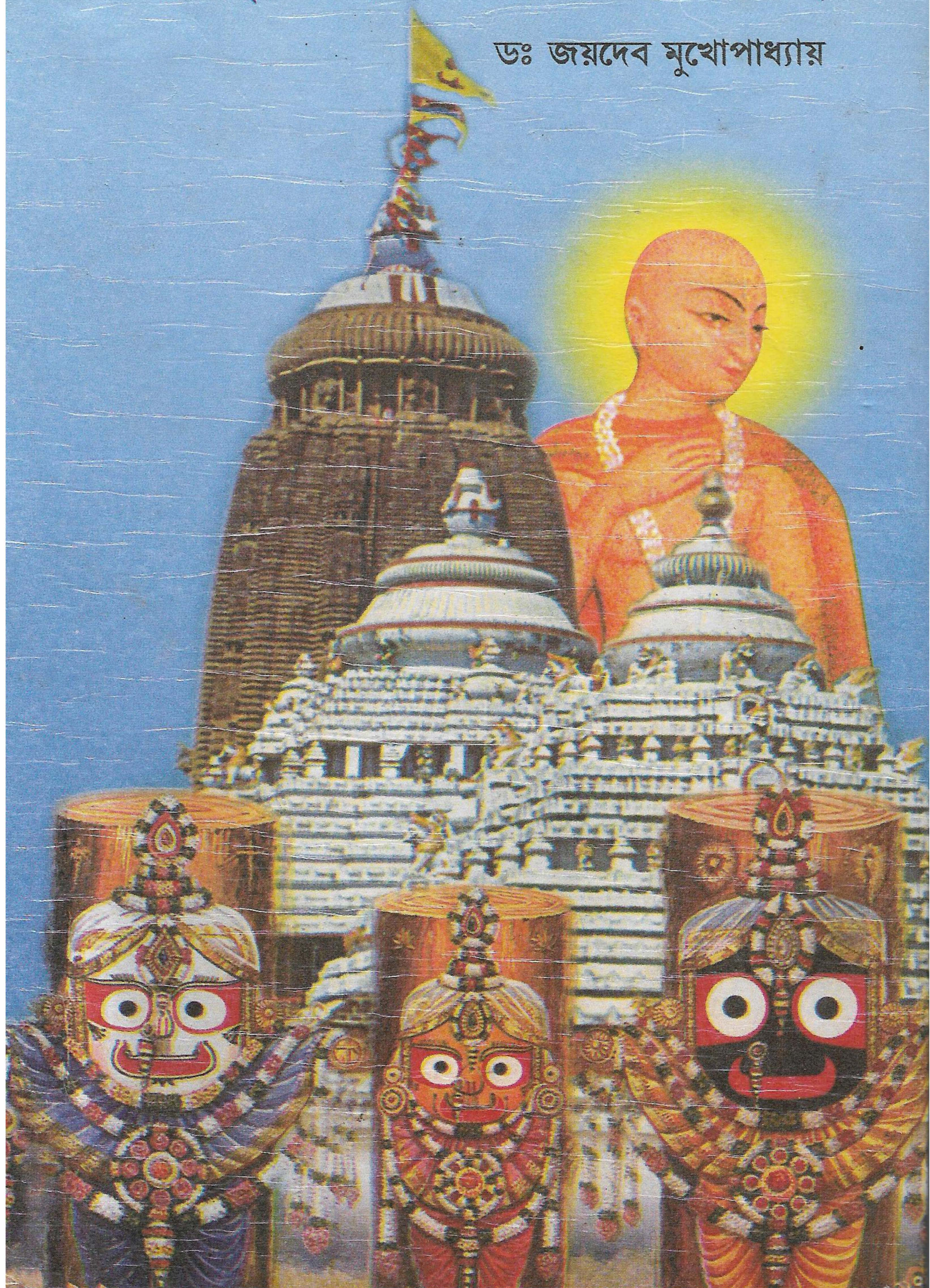
কাঁহা গেলে তোমা পাই

ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়



কাঁহা গেলে তোমা পাই

(শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের উপর একমাত্র প্রামান্য গ্রন্থ)

ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায়

প্রাচী পাবলিকেশনস্

প্রকাশক ঃ
জয়দীপ রায়চৌধুরী
প্রাচী পাবলিকেশনস্
৬৩বি, ন্যাশনাল প্লেস
বাকসাড়া, হাওড়া
পিন—৭১১ ১১০
ফোন : ৯৩৩ ৯১০৮০২৪
৯৯০৩১১০৬৬৩

প্রথম সংস্করণ ঃ
১লা জানুয়ারি (কল্পতরু উৎসব ২০১০)

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ
অক্ষয় তৃতীয়া ১৪১৯

মুদ্রণ ঃ
মহালক্ষ্মী অফসেট
১৩/৪, শ্রীমানি পাড়া লেন
কলকাতা

মূল্য ঃ ১০০ টাকা মাত্র

যাঁর অকৃত্রিম মমতা এবং অপরিসীম সহানুভূতি নীলাচলের অনুসন্ধানী মুহূর্তগুলিকে প্রতিনিয়ত অনুরাগে রঞ্জিত এবং অনুপ্রেরণায় স্পন্দিত করে রেখেছে, অগ্রজপ্রতিম পরমবৈষ্ণব এবং আয়ুর্বেদবিশারদ যোগেশ দা'র স্নেহ-কোমল করকমলে 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' সকৃতজ্ঞচিত্তে তুলে দিলাম।

প্রীতিধন্য

লেখক

KNAHA GELE TOMA PAI

Vol. I

By

Dr Joydeb Mukhopadhyaya

অভিমত

"সে কোথায়"

প্রতি বছরের মত ১৯৭৬-এর জুনে পুরী এসে ক্রমে শুনলাম আনন্দময়ী আশ্রমের সংলগ্ন গৃহে একজন অধ্যাপক বাস করছেন কোনও গবেষণায় রত হয়ে। সামান্য দেখাশুনা আলাপও হয়েছিল সেবারে। তারপর ১৯৭৭-এর অক্টোবরে পুরী এলে আশ্রমের এক ব্রহ্মচারী আমাকে পাঠিয়ে দিলেন পড়বার জন্য একখানা 'ঝাড়গ্রাম বার্তা' যাতে প্রকাশিত হয়েছে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার বিষয় একটি লেখায়। প্রথমেই পড়ে মুগ্ধ হলাম—একটি ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়বস্তুকে নীরস কঠোর ঐতিহাসিক তথ্যকে রোমাঞ্চকর কাহিনীর আকারে প্রকাশ করবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা দর্শন করে। তারপর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি থাকা সত্বেও ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানের প্রতি তাঁর গভীর নির্ভীক নিষ্ঠাও মনকে মুগ্ধ করে। আমার মনে হয় ইহাও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগেরই ফল। যে অনুরাগী সেই প্রেমাস্পদের অশেষ বিশেষ জানতে ব্যাকুল হয়। তাঁরই জিজ্ঞাসা জাগে 'সে কোথায়?'

অর্দ্ধাধিক জগতের নরবপু ভগবান্ যীশুখৃষ্ট প্রকাশ্যেই ঘাতকের দ্বারা দেহ-ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, অর্দ্ধাধিক ভারতের প্রাণ (Soul of India) নরবপু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তঘাতক ব্যাধের গুপ্তবাণের আঘাতে দেহ-ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু তাতে সেই ভগবানের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় নাই, যীশুভক্ত বা শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের ভক্তিও কোনরূপ বাধা বা ন্যূনতাপ্রাপ্ত হয় নাই। তাই, আজ যদি ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান ও তথ্য ইহাই প্রমাণিত করে যে দুর্নিবার নিয়তির বলে নর-বপু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব স্বাভাবিকভাবে বা অস্বাভাবিকভাবে মাতৃগর্ভজাত নর-বপু ত্যাগ করেছিলেন এবং গোপনে সমাধিনিহিত হয়েছিলেন তথাপি তাঁর অলোক

সাধারণ দিব্য মহিমা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে বলে প্রকৃত ভক্তের মনে করা উচিত হবে না, যদিও তাঁদের হৃদয় অব্যক্ত বেদনায় ব্যথিত হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃত ভক্তের ভক্তিও তাতে ক্ষুণ্ণ বা ম্লানতা প্রাপ্ত হবে না। কারণ ভাব-ভক্তির সাধনা চিরদিনই বাস্তবকে স্বীকার করেও বাস্তবেই আবদ্ধ থাকে না, বাস্তবকে অতিক্রম করে বাস্তবাতীত ভাবরাজ্যে বিচরণ করে। ভাবরাজ্যে তাঁদের প্রকৃতি নিয়মাধীন প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহও অপ্রাকৃত তনুর রূপ ধারণ করে।

লেখক তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলে এবং শ্রীচৈতন্য-দেবের কৃপায় বহু প্রাচীন বাংলা ও ওড়িয়া পুঁথি সংগ্রহ ও অনুসন্ধান করে যে সকল মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার দ্বারা আশা করা যায় তিনি অচিরেই তাঁর চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন। প্রকাশিত প্রবন্ধে যে তথ্যগুলি প্রমাণের সহিত তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছেন সেগুলি হল যথাক্রমে :—

(১) রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবকে পত্রের দ্বারা সাবধান করেছেন যে অমুক অমুক ভক্তেরা আসলে তাঁর ভক্ত নয়, গোবিন্দ বিদ্যাধরের চর।

(২) শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর তিরোধানের সেই দিবসে বৈকালে কীর্তন করতে করতে মন্দিরে প্রবেশ করলে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করা হয় এবং প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা পরে রাত্রিতে খোলা হয় এবং প্রচার করা হয় যে মহাপ্রভুর দেহ প্রভু জগন্নাথের দেহে লীন হয়েছে।

(৩) কিন্তু 'প্রত্যক্ষ জানি' বৈষ্ণবদাস লিখেছেন যে তাঁর দেহ গরুড়-স্তম্ভের পাশে মৃত পড়েছিল।

(৪) রাজা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিয়েছিলেন যে মহাপ্রভুর দেহ যেন হরিনাম সহকারে সমাধিস্থ করা হয়।

(৫) রাজা প্রতাপরুদ্র অচিরেই কটকে পলায়ন করেন এবং পুরীধামে কীর্তন বন্ধ হয়ে যায়।

(৬) রাজার দুই পুত্রকে পরপর সিংহাসনে বসিয়ে এক বৎসরের মধ্যেই দুজনেই ঘাতকের হাতে নিহত হলে গোবিন্দ বিদ্যাধর নিজেই সিংহাসনে বসেন ও দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিত্যস্বরূপের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন শ্রীমান জয়দেবকে পূর্বের মতই তাঁর অবশিষ্ট অনুসন্ধান সমাপ্ত করে প্রকাশিত করবার শক্তি, স্বাস্থ্য ও সুযোগ প্রদান করেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী তর্কবেদান্ততীর্থ
(রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত)
অতিরিক্তাধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন ইউ. জি. সি. অধ্যাপক গভর্ণমেণ্ট
সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা, প্রাক্তন
সংস্কৃতাধ্যাপক যাদবপুর, বিশ্ববিদ্যালয়।

"শ্রীরাধাকান্ত জয় শ্রীরাধে প্রাণ-গৌর বিশ্বম্ভর"

[শ্রীধ্যানচন্দ্র দাস নিজে অবাঙ্গালী হয়েও স্বহস্তে এই বাংলা বক্তব্য লিখেছেন। ইনি গম্ভীরার একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সংগঠক হিসাবে পুরীতে বিশেষ সম্মানিত]

গবেষক শ্রদ্ধেয় জে. মুখার্জী মহাশয়ের 'সে কোথায়' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। লেখক মহাশয়ের ভাব ও ভাষা বেশ সরল হওয়ায় ইহা সর্বসাধারণের দ্বারায় আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। চতুর্দশ ভাষাবিদ দেশ-বিদেশ পর্য্যটনকারী সত্যসন্ধিৎসু জ্ঞানপিপাসু আকুমার ব্রহ্মচারী এই লেখক মহাশয়ের লেখনীতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপা প্রেরণা যে অন্তর্নিহিত হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান লীলা সম্বন্ধে লেখক মহাশয় শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের পয়ার "তিন প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥" উদ্ধার করে থাকায় আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। কারণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্তঃলীলা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার নীরব রহিয়াছেন। কেবল শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের উপরোক্ত পয়ার শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলার দিগ্‌দর্শন দেয়। অধিকাংশ ভক্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান লীলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তাঁহারা লেখক মহাশয়ের এই বইখানা পাঠ করিয়া সন্দেহমুক্ত ও আনন্দিত হইবেন আশা করি।

পরিশেষে নীলাচলবিহারী গম্ভীরানাথ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি যেন তিনি বাস্তববাদী উৎসাহী লেখক মহাশয়ের এই সৎ এবং মহৎ বাসনা তথা উত্তরোত্তর উন্নতিপথে সহায়তা করুন। জয়শ্রী গম্ভীরাবিহারী গৌরহরি। ইতি—

শ্রীগম্ভীরাবাসৈকনিষ্ঠ
শ্রীধ্যানচন্দ্র দাস

শ্রীরাধাকান্ত মঠ
শ্রীক্ষেত্র-পুরীধাম
৬। ৬। ৭৮

পঙ্গুং লংঘয়তে শৈলং মূকমা বর্ত্তয়েৎ শ্রুতিং।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণ চৈতন্যমীশ্বরম্॥

[পণ্ডিত হিমাঙ্গভূষণ দাস পুরীর শ্রেষ্ঠ ভাগবত পাঠকরূপে পরিচিত। তাঁর পাণ্ডিত্য বৈষ্ণব-সাহিত্যে এক কথায় তুলনীয়।]

কলিযুগ পাবন শ্রীশচীনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর নিজ শ্যামসুন্দর স্বরূপে যে ভক্তিরস মাধুরীর উৎস ও পরম করুণা নিজ নিত্য পরিকর তথা ভক্ত ছাড়া সর্বজন উপভোগ করিতে পারেন নাই। তাহা কিঞ্চিদূন পাঁচশত বৎসর পূর্বে করিয়া গিয়াছেন। সেই পরোপকার জীবের পরম প্রাপ্য প্রেমধন যে ভাবে এই ধরা ধামে ছড়াইয়া গিয়াছেন তার ইতিহাস তার সমসাময়িক চরিতকারগণ যাহা যেরূপে তাহাদের চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীচৈতন্য মঙ্গল, শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত ও শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় হইলেও শ্রীরামায়ণ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান লীলা বর্ণনের ন্যায় শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান লীলার সূচনা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইহা যেমন এক বিরাট অভাবরূপে দেখা দিয়াছে, তেমনি বড় রহস্যাচ্ছন্নরূপে বোধ হইতেছে। জিজ্ঞাসু ঐতিহাসিকগণের এই অভাব কে মিটাইবে? আমরা কিন্তু এই অনুসন্ধিৎসাকে মোটেই গুরুত্ব দিই না। কারণ নিত্য অব্যক্ত ভগবৎস্বরূপ তাহার কৃপা বা ইচ্ছাতেই জীবজগতে বা মায়ার রাজ্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে সেই ব্যক্ত রূপের অব্যক্ত দৃশ্য শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত ও স্বয়ং ভগবত্তার মধ্যেও দেখা গিয়াছে কিন্তু "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণ জগতি পর তত্ত্বং পরমিহ" চরিতামৃতকারের এই অনুভূতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন কি এই অদৃশ্য অন্তর্দ্ধান লীলা? অন্যান্য অবতারের নিত্যতা পুরাণ-শাস্ত্রে নিরূপিত হইলেও অনিত্যতার ভ্রম জন্মাইয়া দেয় তাঁদের অন্তর্ধান লীলার দৃশ্যের বর্ণনায়।"

কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলার সেই অনিত্যতার ভেদি না থাকায় বোধহয়।

'অতএব চৈতন্যগোসাই পরতত্ত্ব সীমা' তবুও জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসুর এই গৌণ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে বলিষ্ঠ লেখনী ধরিয়াছেন ডক্টর শ্রীমান্ জয়দেব মুখার্জী মহাশয় তাঁহার সর্বোচ্চ যোগ্যতা ভক্তিভাবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি তাহা পারিবেন এই আশা আমাদের আছে। তিনি গৌরসুন্দরের অবদান ও অন্তর্ধান রহস্য আবিষ্কার করিয়া লোকচক্ষুর গোচর করাইবার জন্য শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাকেই সম্বল করিয়াছেন। মনে হয় অনেকটা কৃপা পাইয়াছেন ও আমরাও পূর্ণ কৃপা পাত্র হওয়ার জন্য মহাপ্রভুকে জানাইতেছি।

॥ এক ॥

পুরীগামী জগন্নাথ এক্সপ্রেসের প্রথমশ্রেণীর কামরার চারটি বার্থের একটিতে শুয়ে আনন্দ কেবল চিন্তার আগুনে দগ্ধই হয়ে চলছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল তার ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের লেখা পত্রের সেই সাংঘাতিক রোমহর্ষক কথাগুলি। ৫।৮।৭৬ তারিখের দীর্ঘ পত্রের এক জায়গায় বেশ জোরের সঙ্গেই লিখেছেন তিনি—'শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে গুম খুন্ করা হয়েছিল পুরীতেই এবং সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের দেহের কোন অবশেষের চিহ্নও রাখা হয় নি কোথাও। এবং তা হয়নি বলেই তিনটি কিম্বদন্তী প্রচারের প্রয়োজনও হয়েছিল।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor Emeritus প্রখ্যাত ইতিবৃত্তকার ও সমাজতত্ত্বজ্ঞ ডঃ রায় কোন্ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবি কর্ণপুর, দিবাকর দাস, অচ্যুতানন্দ দাস প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক অথবা প্রায় সমসাময়িক জীবনীরচয়িতাবৃন্দের বর্ণিত চৈতন্য জীবন-নাট্যের শেষ দৃশ্যাবলীকে এমন ফুৎকারে ধূলিসাৎ করে দিতে সাহসী হলেন তা অবশ্যই সহজবোধ্য নয়। কিন্তু একথাও তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জ্ঞানতপস্বী ও সত্যসন্ধানী নীহারবাবু অকারণেই কোন ভিত্তিহীন অথবা অগ্রহণীয় সিদ্ধান্ত এমনভাবে অতি অকস্মাৎ হাওয়ায় ছেড়ে দিয়ে সস্তায় কিছুটা 'চমক' লাগিয়ে দেবার মত লঘুচিত্তের মানুষ কখনই নন! তাঁর ঐ পত্রেই তিনি আরও লিখেছেন—'ঐ

গুম্‌খুনের সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বহুদিন চিন্তিত, বহুজন সমর্থিত চক্রান্তের ফল। কে বা কারা এই চক্রান্ত করেছিলেন আমার অনুমান একটা আছে, কিন্তু তা বলতে পারব না। কারণ এখনও আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই। চৈতন্যদেব, গান্ধী martyr হতে পারেন। আমার martyr হবার কিছুমাত্র বাসনা নেই।' আশ্চর্য্য! 'বৈতরণী' গ্রন্থে (Vol. XI. P. I) যাঁর সম্বন্ধে লিখ্‌তে গিয়ে বলা হয়েছে—'Orissa was Chaitanya and Chaitanya was Orissa. The king, the subjects, the high and the low—all were mad after him.' যাঁর মহাপ্রভাবের কথা চিন্তা করে কেনেডি (Kennedy) তাঁর the "Chaitanya movement" (P. 75)-এ উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন—'Orissa became such a stronghold of the Chaitanya faith that to-day the name of Gouranga is more commonly reverenced and worshipped among the masses in Orissa than in Bengal itself'. তাঁকেই গুম্ খুন্ করা হয়েছিল উৎকলের পুণ্য সাগরতীর্থ পুরীতেই ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে।

এমন কথা বিশ্বাস করার চেষ্টার মধ্যেও যে একটা হাহাকার আর্তনাদ করে ওঠে, সেই আর্তনাদই ঝঙ্কার তুলতে চাইছে যেন দুরন্ত বেগে ছুটন্ত জগন্নাথ এক্সপ্রেসের লৌহাঙ্গের গতি-মূর্ছনায়। তাই আপার বার্থের কোমল শয্যাতে শুয়েও নিদ্রাহীন আনন্দের মস্তিষ্কে চিন্তাগ্নি শিখা যেন আরও বেশি লেলিহান হয়ে উঠতে চাচ্ছিল ক্রমে ক্রমে। তারই কামরায় অপর তিনটি বার্থে অন্য যারা আজ রাত্রিতে আনন্দের সহযাত্রী—তারা যে কী এবং কারা, সেটুকু জানবার আগ্রহ পর্যন্ত একবারও দেখা দেয়নি তার মধ্যে।

অথচ আনন্দের বার্থ থেকে দেখা যায় যে লোয়ার বার্থটির সবটাতেই আশ্রয় নিয়ে যে যুবতীটি তার পিতার সঙ্গে চলেছে

আজ নীলাচলাভিমুখে, তার দিকে একটিবার তাকালে কিন্তু নিজের দৃষ্টি আর হঠাৎ ফিরিয়ে নিতে পারতো না আনন্দ অন্যদিকে। এমনই লাবণ্য আর রূপৈশ্বর্য তার।

বিরজার কিন্তু দৃষ্টি ঠিকই পড়েছিল বিঘ্নিত-নিদ্রা আনন্দের অস্বাভাবিক ছটপটানির দিকে। গাড়ীর ঝাঁকানিতে যখনই ঘুমটা পাতলা হয়ে আসছিল তার, তখনই সে সবিস্ময়ে ভাবছিল, আপার বার্থের বাসিন্দা যুবকটি অমন করছে কেন? কেন সে এপাশ আর ওপাশ করে কাটাচ্ছে সারারাত অমন অশান্ত এবং বিনিদ্র অবস্থায়? দেহের কোথাও কি কোন কষ্ট হচ্ছে ওর?

কষ্ট অবশ্য হচ্ছিলই আনন্দের, কিন্তু সে কষ্ট যে তার দেহের কোথাও নয়, মনের গভীরে, সেটুকু কুমারী বিরজা চ্যাটার্জীর কাছে অবোধ্য রইলেও, এ-কাহিনীর সুধী পাঠক-পাঠিকার যে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না একেবারেই আমার এ ধারণাটা মিথ্যা নয় আশা করি।

মনের গভীরে তোলপাড় শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই, যেদিন ডঃ রায়ের চিঠি প্রথম এসে পৌঁছল আনন্দের হাতে। চিঠিটা আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল প্রথমে আনন্দ। এর আগে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যখনই কিছু শুনেছে কারও কাছে, তখনই সে জেনেছে নীলাচলে গিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর সন্ন্যাসী লীলা শেষে বিলীন হয়ে গেছেন জগন্নাথ মন্দিরে জগবন্ধুর শ্রীমূর্ত্তির ভেতরে। কেউ বা তোটা গোপীনাথের জঙ্ঘাদেশের সোনালি চিড়টুকু দেখিয়ে বলেছে—ঐ চিড়ের ফাঁক দিয়েই গৌরাঙ্গসুন্দর মিলিয়ে গেছেন গোপীনাথের মূর্ত্তির মধ্যে। কেউ বা সবজান্তার সুরে গুরুগম্ভীরভাবে বর্ণনা করেছে এক পূর্ণিমা রাত্রে শ্রীচৈতন্যের বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জনের প্রচলিত কাহিনী। আবার দুই একজন গুণ্ডিচা বাড়ীতে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান হওয়ার কাহিনীও যে না শুনিয়েছে এমন নয়। কিন্তু সে সব কিম্বদন্তীর কোনটাতেই অন্তরে আঘাত লাগার মত ছিলনা

কোন কথা, ছিল না রক্তাক্ত বীভৎসতার কোন ইসারা বা ইঙ্গিত। বরং, ঐ সব কিম্বদন্তী শুনে আনন্দের অন্তরে এক নতুন রসের জোয়ারই উত্তাল হয়ে উঠতে চেয়েছে যেন। কারণ, ঐ কিম্বদন্তী-গুলোতে রয়েছে দেবকল্প এক মহাপুরুষের অলৌকিক অন্তর্ধানের ভক্তিরস সৃষ্টিকারী কিছু শ্রুতিসুখকর রহস্যের বিস্তার।

কিন্তু নীহারবাবু লিখেছেন যে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা!

অনিন্দ্যসুন্দর প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যিনি জীবনের পরম বসন্তের লগ্নে গৃহত্যাগী হলেন অনন্যরূপসী ভার্যা আর স্নেহময়ী মাতৃদেবীকে পেছনে ফেলে, কেবলমাত্র দুঃখী-তাপীর জ্বালা মেটাতে আর নিপীড়িত অবহেলিত অজস্রকে বিবেকবর্জিত বিত্তবানের অত্যাচারের খড়্গ থেকে রক্ষা করতে। যিনি উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেব, প্রদেশপাল রায় রামানন্দ, পণ্ডিত চূড়ামণি সার্বভৌম ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে শূকরচারণকারী ডোম (চৈঃ চঃ আঃ ১০।৮৩), শ্রীবাসের বস্ত্রসীবনকারী যবন দর্জি (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৩২), পাঠান পীর ও সশিষ্য বৌদ্ধাচার্য (চৈঃ চঃ মঃ ৯।৪৭-৬২), শ্রীনিত্যানন্দের অলঙ্কার লুণ্ঠনকারী দস্যু সেনাপতি (চৈঃ ভাঃ আঃ ৫।৫২৬), বিজলী খাঁর ন্যায় পাঠান রাজকুমার (চৈঃ চঃ মঃ ১৮।২০৭-২১২), এমন কি গৌরগোপালের গাত্র-গহনা অপহরণকারী চোরকেও (চৈঃ ভাঃ আঃ ৪।১৩২) তাঁর হৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করে তাদের সকলকে আশ্রয় দান করেছিলেন নিজ স্নেহস্নিগ্ধ অমৃতময় ক্রোড়ে। সেই লক্ষ ভক্তের পরম ভালবাসার ধন শ্রীচৈতন্যকে হত্যা করেছিল কোন্ সে শয়তানের নির্দয় কৃপাণ? ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—কিভাবে তাঁর দেহাবসান ঘটেছিল সে সম্বন্ধে আমার কিছু যুক্তি-নির্ভর ধারণা আছে। কিন্তু সে ধারণাটি আমি প্রকাশ্যে বলতে বা ছাপার অক্ষরে লিখতে পারব না; যদি বলি বা লিখি, তা'হলে বঙ্গদেশে প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পারব না।

কী তাঁর সেই যুক্তি নির্ভর ধারণা? কোন্ সে পৈশাচিক

পরিবেশে সর্বজীবে সমদর্শী প্রেমের পূজারী এক সর্বত্যাগী নিরস্ত্র সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যব্যাপ্ত জীবনে নেমে এসেছিল অকাল মৃত্যুর করাল যবনিকা? মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর বয়সের শেষে কারা হত্যা করেছিল তাঁকে? কেনই বা করেছিল? কেন? কেন? কেন? মুদিতনেত্রেই এক সময়ে বিড়বিড় করে উঠল আনন্দ। 'আমাকে চেষ্টা করতেই হবে একবার। শ্রীগৌরাঙ্গের আকস্মিক অন্তর্ধান রহস্যটি উদ্‌ঘাটন করে এতদিনের চলে আসা ইতিহাসের নামে অনৈতিহাসিক অবিশ্বাস্য উদ্ভট সব কল্পকথার অবসান না ঘটাতে পারলে, বৃথাই হবে আমার এবারকার এই নীলাচল যাত্রা।'

আনন্দের ঐরকম অদ্ভুত অবস্থা এবং তারপরে উত্তেজিত কণ্ঠে তার ঐ বিড়বিড়ানি শুনে, কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা আতঙ্কে বিরজা ব্যস্ত পদে উঠে নিজে পাশের বার্থে শুয়ে থাকা নিদ্রাচ্ছন্ন পিতাকে ডেকে তুললেন তাঁর দেহে মৃদু করাঘাত করে। নিম্নস্বরে বললেন— ওপরের বার্থের ঐ ছেলেটা সারারাত কেমন যেন করছে বাবা! একটু আগেই দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে কী সব যেন বক্‌ছিল আপন মনে। স্বাস্থ্যবান শুভ্রকেশ সৌম্যদর্শন সোমনাথবাবু তন্দ্রালু চোখ মেলে শুধালেন, কী বলছিল—তা বুঝি শুনতে পাস্‌নি?

দু' একটা কথা কেবল কানে এসেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ, অন্তর্ধান-রহস্য, নীলাচল যাত্রা।

'এসব কথার কোনটাই তো খারাপ কথা নয় মা। এতে তোমার ভয় কিসের?'

ও যে দাঁতে দাঁত ঘষে বল্‌ছিল এসব কথা। পাগল কিম্বা মৃগীরুগী নয় তো?

'হতে পারে।' বলে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় মশায়, একটি হাই তুলে আর একবার ঘুমোতে সচেষ্ট হতেই অপর আপার বার্থের মানুষটি প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল—ভয় আছে মশাই ভয় আছে। ভয়ঙ্কর ভয়। লোকটা যা কাণ্ড করছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, আর

যে সব কথা বলছে—তা দেখা আর শোনার পরেও, এখনও যে এই ক্যুপে'র কূপে চুপটি করে পড়ে আছি তার একমাত্র কারণ এত রাতে অন্য কোনো ক্যুপেতে কেউ আমায় বার্থ দিতে রাজী হবে না বলে। সোমনাথ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তিলক চর্চিত ললাট ও নাসিকা, গলায় তুলসীমালাধারী, কেশহীন চক্চকে মাথা ভদ্রলোকটির পানে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনিও কি শুনেছেন ঐ ছেলেটির কথা?' নাকে আঁকা তিলকটিকে কুঁচকে হাসল একবার ভদ্রলোক। তারপর বলল—'তা আর শুনি নি? আর শুনেছি বলেই তো একটু আগে বলেছি আপনাকে—ভয় আছে মশাই, ভয়ঙ্কর ভয়।'

বিরজা এবার তাঁর সমর্থকের সহায়তায় এগিয়ে গেল—শ্রীগৌরাঙ্গ, অন্তর্ধান রহস্য—এইরকম ধরনের কী সব যেন বিড়বিড় করে বলছিল না ও? বলছিলই তো। ভয়ানক উৎসাহিত হয়ে উঠল তিলকধারী, বোঝা গেল তার এখনকার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে। হঠাৎ সুর নামিয়ে পুনরায় প্রায় ফিস্ ফিস্ করেই শুনাল, সে বলছিল কি জানেন? বলছিল—শ্রীগৌরাঙ্গের আকস্মিক অন্তর্ধান রহস্যটি উদ্ঘাটন করবেই নাকি ও। কী মারাত্মক কথা মশাই, পুরীতে গিয়ে এমন কথা একবার উচ্চারণও যদি ও করে, তবে নির্ঘাৎ সেখানকার মঠ আখ্ড়ার বৈষ্ণব বাবাজীদের হাতের ঝাঁটা ওর কপালে লেখা আছে সে কথা আমি এখনই হলফ করে বলে দিতে পারি। এই সব লোকের সঙ্গে কথা বলাটাও নিরাপদ নয়, বুঝলেন? বোষ্টমরা ভাবতে পারে আমরাও বুঝিবা ওরই দলের। এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক সভয়ে একবার আড়চোখে দেখে নিল তার অদূরস্থ আপার বার্থে তখনও শুয়ে থাকা সেই বিপজ্জনক যুবক সহযাত্রীটিকে।

বিরজা জানতে চাইল—সত্যিই যদি ঐ ছেলেটি গৌরাঙ্গদেবের হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার রহস্য জালটুকু ছিন্ন করতে উদ্যোগী হয়ই,

তারজন্যে পুরীর বৈষ্ণবকুলের সম্মার্জনী ওর বরাতে জুটবে কেন? এতে ওর অপরাধটা কোথায়? মুখ দিয়ে স্ স্ স্ করে একটা শব্দ বার করে দক্ষিণ তর্জনীটা নিজের ঠোঁটের ওপর রেখে, তুলসীমালা পরিহিত ভদ্রলোক চাপা কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল—আঃ, আস্তে বল। ঐ গোঁয়ার গোবিন্দের তন্দ্রা ছুটে যদি যায় আর তার পরেই যদি শুনতে পায় আমাদের আলোচনার বিষয় তাহলে কি আর রক্ষা থাকবে? বলে মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে পকেট থেকে একটা মোষের শিং-এর কৌটা বের করে তা থেকে দু' টিপ নস্যি নিয়ে সজোরে গুঁজে দিলেন নিজের দুই হাঁ-হওয়া নাসারন্ধ্রে। তারপর, একটা কুটকুটে ময়লা ন্যাকড়া অপর পকেট থেকে হেঁচকে বাইরে এনে, নাকের ডগায় লেগে থাকা ইঞ্জিনমার্কা-নস্যের প্রলেপটাকে ঘন ঘন মার্জনায় তুলে ফেলার চেষ্টা করতে করতে আবার ফিস্-ফিসালেন তিনি। আমার কপাল আর নাকে আঁকা তিলক থেকে এটুকু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না নিশ্চয়ই যে, আমিও এক পরম বৈষ্ণব। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বৈষ্ণবদের মনের খবর আমি যতটা জানি, নিশ্চয়ই ততটা তোমার বা তোমার বাবার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমি বলছি, স্বয়ং ভগবান বলে আমরা যে মহাপ্রভুকে গ্রহণ করেছি এবং প্রচার করেছি, তাঁর অলৌকিক অন্তর্ধান সম্বন্ধে সামান্যতম সংশয় প্রকাশ করাটাও যে কোন বৈষ্ণবের চোখেই একটা অমার্জনীয় অপরাধ।

সোমনাথবাবু লাইটার জ্বালিয়ে একটা চুরুট ধরালেন। শুধালেন—'কিন্তু কেন?'

কেন আবার। যিনি নিজেই ভগবান, তাঁর কি কখনও মৃত্যু হতে পারে সাধারণ মানুষের মত? তাঁর পক্ষে অন্তর্ধান হওয়াটাই তো স্বাভাবিক! তাই নয় কি?

ওপরের তিলকচর্চিত ভদ্রলোক এবার বিনা আমন্ত্রণেই নীচে নেমে আসন গ্রহণ করলেন বিরজার বার্থের এক প্রান্তে। কিন্তু

ইতিহাসের একজন অধ্যাপক হয়ে আমি আপনাদের এই অন্তর্ধানের থিওরীটা মানতে রাজী নই ভায়া। স্পিরিট মিলে যেতে পারে স্পিরিটের সঙ্গে, সে অন্তর্ধানকে বিজ্ঞানও স্বীকার করে। কিন্তু হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে আর সেটা গিয়ে লীন হবে জগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গে, যে অঙ্গটিও নিমকাঠ, পট্টরজ্জু, গঁদ আর ধুনোর আঠায় তৈরী একটি ম্যাটার বৈ আর কিছুই নয়, এমন কথা কোন সংস্কারান্ধ অপ্রকৃতিস্থ মানুষ ছাড়া আর কেউ মেনে নেবে বলে তো আমার মনে হয় না। আমিও চৈতন্যদেবের শেষ মুহূর্তটা সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে কম চেষ্টা তো করিনি আমার যৌবনে।

কথা শেষ করে, দুই ঠোঁটের মধ্যে পুনশ্চ চুরুটটাকে গুঁজে দিলেন চার পুরুষ ধ'রে মধ্যপ্রদেশ প্রবাসী অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কী সর্বনাশ! তিলকধারী আঁৎকে উঠলেন মনে হল। 'আপনিও তা হলে ঐ গোঁয়ার গোবিন্দেরই দলে?'

বিরজা একটু হেসে বলল—'কিন্তু, এমনও তো হতে পারে, ছেলেটি আসলে ঘুমের ঘোরে যা বলেছে তা কেবল মৃগীরুগী অথবা পাগলের অর্থহীন প্রলাপ!'

'অসম্ভব!' তুলসীমালাধারী বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতটা ঠুকে বলে উঠল—'আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি ঐ আকাট গোঁয়ারটা পুরীতে যাচ্ছে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানকে রহস্যজাল থেকে উদ্ধার করার মৎলব নিয়ে। যাক্ না, করুক না চেষ্টা একবার পুরীতে গিয়ে, বুঝবে ঠেলাটা।

ঠেলা আর কী বুঝবে বলুন। একমুখ চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে কাশতে কাশতে বললেন সোমনাথ। আমি একবার চৈতন্যদেবকে ওড়িয়া বলাতে নবদ্বীপে কয়েকজন প্রবীণ বৈষ্ণব মারমুখী হয়ে উঠেছিলেন আমার ওপরে, সে কথা আমি আজও

ভুলিনি। কিন্তু তাই বলে কি আমি আমার মতটা পাল্টে ফেলেছি ?

'আপনার মতটাই যে সত্য, তার কোনো প্রমাণ আছে ?'

আছে বৈকি! ইতিহাসের ছাত্র আমি আজও। তথ্য ও প্রমাণ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো তাই আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

'বাঙ্গালী গৌরাঙ্গদেব হঠাৎ ওড়িয়া বনে গেলেন কেমন করে জানতে পারি কি ?'

আপনি নিজে বাঙ্গালী হয়ে··,ললাটের তিলক কুঁকড়ে মুচড়ে বিকৃত হয়ে উঠল ভদ্রলোকের। উত্তেজনার আধিক্যে বাক্য তিনি শেষও করতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত।

শান্ত স্বরে সোমনাথ বললেন—বিশ্বম্ভর বা চৈতন্যের ঠাকুরদা ছিলেন উপেন্দ্র মিশ্র। তাঁর ভিটা ছিল কটক জেলার যাজপুরে। যে কোন কারণে হোক, তিনি যাজপুর ত্যাগ করে শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণগ্রামে চলে যেতে বাধ্য হন ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে। আবার মহাপ্রভুর পিতা কোন না কোন কারণে, বোধ হয় জীবিকা অর্জনের তাগাদাতেই, ঢাকা দক্ষিণ ছেড়ে ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে চলে যান ভাগীরথী তীরবর্তী নবদ্বীপে। সেখানেই নিমাই এর জন্ম হয় ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফাল্গুন শনিবার (জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার অনুসারে ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং গ্রেগরিয়ন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ২৭শে ফেব্রুয়ারী)। তবু পিতামহের জন্মভূমির হিসেবে মহাপ্রভুকে তাই ওড়িয়া বলে স্বীকার না করলে ইতিহাসের সত্যকে কি অস্বীকার করাই হবে না ? (নীলকণ্ঠদাস লিখিত 'ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য' পৃঃ ১১০)। নেতাজী সুভাষ জন্মেছিলেন কটকে, তাই বলে কি তিনি বাঙ্গালী নন ? বিরজা বলল—ঐ মিশ্র পদবীটা আমার মনেও খটকা জাগিয়েছে অনেকবার। বাঙ্গালীর কি মিশ্র পদবী হয় ?'

ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে, চোখ মুখ ভেঙচে, বিকৃত স্বরে তিলকচর্চিত

চিল্লে উঠল—বাঙ্গালীর কি মিশ্র পদবী হয়? মরি মরি প্রশ্নের ছিরি দেখ। এই বলে একটু দম নিয়ে আবার তর্কের তুফান তুল্‌লে তুলসীমালাধারী। মিশ্র পদবী পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের কাছে একেবারেই অজানা ছিল না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর বাপের নাম ছিল হৃদয় মিশ্র। 'মিশ্র' যে তখনকার দিনের একটা সম্মানসূচক পদবী সেটুকুও জানা নেই বুঝি ইংরেজী-নবীশ মা জননীর? ওঝা তো এখন মৈথিল ব্রাহ্মণদের পদবী। কেবল-মাত্র সেই কারণেই কি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পিতা হাড়াই ওঝা আর কৃত্তিবাসের পিতামহ মুরারি ওঝাকে মিথিলার মানুষ বলে ঘোষণা করতে হবে? আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা, এমন যুক্তির মাথায় মারো মুগুর।

সহজ হাস্যে নয়ন পূর্ণ করে বিরজা জানাল—'আপনি ভীষণ রেগে যাচ্ছেন কিন্তু।'

রাগ তো হবারই কথা। রাগের কথাই বলেছেন যে আপনি এবং আপনার বাবা। এই বলে আপার বার্থের শয্যা ছেড়ে ধড়মড় করে উঠে বসল আনন্দ সবাইকে থতমত খাইয়ে দিয়ে।

বিরজা কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করল—রাগের কথা বলেছি আমরা?

তা কিছুটা বলেছেন বৈকি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের পিতামহের বাস ছিল যাজপুরে। সেই সূত্রে চৈতন্যদেবকে আপনার বাবা ওড়িয়া বলতে চাইলে আমার আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু নবদ্বীপ যাঁর জন্মভূমি ও সমস্ত কর্মকৃতির মূল উৎস এবং বঙ্গভূমিই যাঁর প্রধান উত্তরাধিকারী, তাঁকে বাঙ্গালী বলতেই বা দোষ কি?

সোমনাথবাবু তাড়াতাড়ি ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে নিয়ে বলতে চাইলেন, না, না—একথা অবশ্য একদিক দিয়ে ঠিকই। তবে আমি বলতে চেয়েছিলাম—, কিন্তু কথা তাঁর শেষ হবার

পূর্বেই আনন্দ পুনর্বার বলে উঠল—আর 'মিশ্র' পদবীর কথা? তখনকার দিনে বঙ্গদেশে, কামরূপে, শ্রীহট্টে, ওড়িষায় যে সব ব্রাহ্মণেরা মৈথিল-স্মৃতি অনুসারী ছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই 'মিশ্র' পদবী ধারণ করতেন (জীমূতবাহন—ভবদেব ভট্ট-শূলপানি-রঘুনন্দন স্মৃতি অনুসারী নন, যা বাঙ্গালী অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন)। এঁরা সাধারণতঃ অনুসরণ করতেন বাচস্পতি মিশ্রের স্মৃতি। মহাপ্রভুর পিতামহ যে যাজপুর থেকে শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণগ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন তার প্রধান কারণ আমার মনে হয় এই যে, তখন সিলেট জেলার নানা জায়গায় বাচস্পতি মিশ্রের মৈথিল-স্মৃতি অনুসারী এক বৃহৎ ব্রাহ্মণ সমাজ বিদ্যমান ছিল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে সোমনাথ বেশ কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলেন যুবকের কোঁকড়ান চুল, উন্নত ললাট, আর্য-নাসিকা ও প্রত্যয়-দৃপ্ত দুই মস্ত চোখের পানে। তারপর মৃদু হেসে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন—'তোমার কথায় যুক্তি আছে তা অস্বীকার করব না।'

'আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের'—আনন্দ অধ্যাপক মশায়ের সপ্রশংস স্বীকৃতি শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না ঠিকমত, সে বলেই চলল—'পঞ্চদশ, ষোড়শ এমন কি সপ্তদশ শতাব্দেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বঙ্গ ওড়িষায় আজ যতটা পার্থক্য তখন ততটা ছিল না। এমন কি ভাষার দিক থেকেও নয়।'

তিলকধারী ভদ্রলোক এতক্ষণ নিঃশব্দেই বসেছিল নিশ্চল হয়ে। এইবার হঠাৎ দুই হাতে তালি বাজিয়ে উল্লাস প্রকাশ করল সে—'ব্যস, তবে তো প্রমাণ হয়েই গেল নিমাই আমাদের বাঙ্গালীই ছিলেন।'

'এতে হাততালি দেবার কী আছে এত?' আনন্দের গুরু গম্ভীর গলার স্বরে বেশ কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল তুলসী-মালাধারী। ছোক্‌রাটাকে নিজের দলের একজন ভেবে

ভদ্রলোক হাততালি দিয়ে তাকে তারিফই তো করতে গিয়েছিল, তাতেও গোঁয়ার গোবিন্দ কিনা ধমক দিয়ে উঠল। প্রশংসা করলে খুশি হয় না, এ আবার কোন্ জাতের জোয়ান রে বাবা!

আনন্দ ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল এবার। 'অবশ্য যত বাঙ্গালীই তিনি হোন্ না কেন, ওড়িষার প্রতি তাঁর যে একটা বিশেষ মমত্ববোধ ছিল, সেটা কিন্তু আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। নবদ্বীপ ছেড়ে যাজপুর হয়ে পুরী যাওয়া, সেখানেই বাকী জীবন কাটানো, রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ইত্যাদি বিবেচনা করে মনে হয় ওড়িষার সঙ্গে তাঁর একটা আত্মিক যোগাযোগ চিরদিনই ছিল। নবদ্বীপ থেকে পালিয়ে তিনি তো কাশী, দ্বারকা বা মথুরায় যেতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা তো যান নি।'

ঠিক। আসল কৃষ্ণ-তীর্থ তো দ্বারকা এবং মথুরায়। সেদিকে না গিয়ে মহাপ্রভু কেন পুরীকে বেছে নিলেন তাঁর প্রেমধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র হিসেবে, সেটা অবশ্যই ইতিহাস গবেষকদের ভেবে দেখতে হবে। একটা আত্মিক আকর্ষণ না থাকলে এমনটি হওয়া হয়ত সম্ভব হ'ত না। সোমনাথবাবুর কণ্ঠস্বরে, নয়ন-দৃষ্টিতে কোথাও আর নিদ্রার চিহ্ন মাত্র নাই।

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ আবার বলে উঠল— চৈতন্যচরিতামৃতে তো স্পষ্টই লেখা আছে—জগদানন্দ পণ্ডিতকে শচীমাতার কাছে পাঠাবার সময় চৈতন্যদেব মাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন —

নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব, তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৯।১১)

অর্থাৎ মাতার আদেশেই চৈতন্যদেব পুরীতে এসেছিলেন। সোমনাথ

সমর্থনের সুরে বললেন—তোমার অনুমান মিথ্যা নয় বলেই মনে হয়। শচীদেবী তাঁর শ্বশুর কুলের আদি আবাসভূমি যে উৎকলে তা ভালভাবেই জানতেন বলেই বোধ হয় সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন শ্রীক্ষেত্রকে নিজ ধর্মপ্রচার ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করতে। কিন্তু এসব কথা এখন থাক্। তুমি শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছ দেখছি এই বয়সেই। কোন কিছুর ওপর গবেষণা করছ নাকি?

এতক্ষণের দৃপ্ত, উদ্দীপ্ত দুই আঁখি মুহূর্তে সলজ্জ হয়ে উঠল আনন্দের। বিরজা লক্ষ্য করল সেটা। মুখ নামিয়ে অকারণেই উত্তর দানে বিলম্ব করতে লাগল সে।

'কই জবাব দিলেন না বাবার প্রশ্নের? আপনি বুঝি চৈতন্যকে নিয়ে রিসার্চ করতেই পুরী যাচ্ছেন?'

বিরজার প্রশ্নে এবার ঝাঁ করে মুখ তুলে তাকাল আনন্দ। বিস্মিত হয়ে বিরজা দেখল—একটু আগেকার সেই লজ্জাড়ষ্ট ভাব চক্ষের নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে ছেলেটার চোখমুখ থেকে। পরিবর্তে তার আবার ঝকমক করে উঠেছে প্রখর প্রত্যয়দৃঢ়তা তার দৃষ্টির ভাষায়। বিরজার কথার কোন উত্তর না দিয়ে চকিতে তার পিতার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে আবেদন জানাল সে, আপনার মুখেই শুনেছি আপনি ইতিহাসের অধ্যাপনা করছেন। আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন না আমার এই অন্বেষণ চেষ্টায়?

স্নেহের হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে সোমনাথ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—'নিশ্চয়ই করব—অবশ্য যদি তা আমার সামর্থ্যের বাইরে না হয়। কিন্তু কিসের অন্বেষণ তোমার তা তো বললে না?'

বলব, সব বলব আপনাকে। পুরীতে কোথায় উঠবেন আপনারা? কতদিন থাকবেন?

আমাদের এক আত্মীয় আছেন চক্রতীর্থের দিকে। এবার

উঠব সেখানেই। আর থাকব মাস দুই। বেশীদিন থাকার তো উপায় নাই। আমার এই মা'টি যে চলে যাচ্ছে ইংলণ্ডে পড়াশোনার জন্যে। ওর পাঠ্য বিষয় কি জান? তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব।

আনন্দ ভালভাবে চেয়ে দেখল্ এবার বিরজাকে। বাইশ তেইশ বছরের এই আশ্চর্য রূপবতী মেয়েটি একা যাবে সাত-সাগর পারের ইংলণ্ডে? সাহস তো কম নয়?

'আপনি কোথায় উঠবেন—তা তো বললেন না?'

বিরজার কৌতূহলী প্রশ্ন।

'আমি আশ্রয় নেব স্বর্গদ্বার শ্মশানের পাশেই এক আশ্রমে। একটু থেমে কী যেন ভেবে নিল আনন্দ একবার। তারপর হঠাৎ মিনতির সুরে বলেই ফেলল ফস্ করে—'আপনার বাবার মত আপনিও তো কিছুটা সাহায্য করতে পারেন আমায়।'

কিন্তু কী কাজে সাহায্য করতে হবে—তাই তো এখনও জানতে পারিনি আমরা।

অত্যন্ত গাঢ়স্বরে কথা কইল এবার আনন্দ। বলল—'ইতিহাসের স্রোতের মুখ সত্যের দিকে ঘুরিয়ে দেবার কাজে।'

'তার মানে?' বিরজা জানতে চাইল।

শ্রদ্ধেয় ডঃ নীহার রঞ্জন রায় লিখলেন—শ্রীচৈতন্যের দেহাবসান কিভাবে ঘটেছিল সে সম্বন্ধে আমার কিছু যুক্তিনির্ভর ধারণা আছে। কিন্তু সে ধারণাটি আমি প্রকাশ্যে বলতে বা ছাপার অক্ষরে লিখতে পারব না; যদি বলি বা লিখি বঙ্গদেশে প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পারব না; তাঁর একথা থেকে এটুকু সহজেই বোঝা যায় দেশবরেণ্য ইতিবৃত্ত-কারের ধারণায় চৈতন্যের দেহাবসানের এমন এক চিত্র জ্বল্ জ্বল্ করছে, যে চিত্রটি আজ পর্যন্ত কোন ইতিহাস বা কাব্যে পাওয়া যায় নি এবং যে চিত্রটি প্রকাশ করলেই সমূহ বিপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে

পারে তাঁর ওপরে। আমি এ যাত্রায় পুরীতে চলেছি কেবল সেই চিত্রটিরই অনুসন্ধান করতে।

চৈতন্য চরিতামৃতে বার্দ্ধক্যন্যুব্জ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কম্পিত করে লেখনী ধরে হঠাৎ লিখে বসলেন—

শেষ লীলার সূত্রগণ কৈলুঁ কিছু বিবরণ,
ইহাঁ বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ু শেষ বিস্তারিব লীলা শেষ
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥

(চৈঃ চঃ, মঃ, ৮৯)

কবিরাজ গোস্বামীর এই শ্লোকটি পড়লে কি এমন মনে হয় না যে মহাপ্রভুর শেষলীলা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আরও কিছু বলার ছিল তাঁর, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, বলা আর হয়ে ওঠেনি শেষ পর্যন্ত। আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে চৈতন্যদেবের শেষ লীলার সেই না-বলা ঘটনাবলী, যেমন করেই হোক। বক্তব্যের শেষের দিকটায় বিরজা স্পষ্ট দেখতে পেল ছেলেটার মুখের দুই চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠেছে, চোখে শপথ রক্ষার নিষ্ঠা সুকঠিন একাগ্রতায় শাণিত ছুরিকার মতই জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠছে থেকে থেকে।

'কিন্তু এসব কাজে যে অনেক বিপদ আছে গোঁসাই।' চক্‌চকে টাক, গঙ্গামাটির তিলকাঙ্কিত কপাল ভদ্রলোকটি তালভঙ্গ করে বাক্যবাণ তাক্ করল এবার।

'আমি গোঁসাই টোসাই নই।' যুবকের প্রতিবাদ।

'ও বাবা, গোঁসাই নও আবার! একটু আগেও যাকে দেখলাম ঘুমের ঘোরে উচ্চারণ করছে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম, চৈতন্যের অপ্রকট লীলা নিয়ে চিন্তায় ডুবে আছে যে দিনরাত—সে যে আমার মতন মুখ্যু বুদ্ধিহীনের কাছে এক পরম গোঁসাই গো! তা, যা বলছিলাম। পুরীতে গিয়ে যাকে তাকে যেন তোমার নিজের মৎলবের কথা

বলে বোস না, গোঁসাই। তাহলে কিন্তু তোমার অপমানের আর সীমা পরিসীমা থাকবে না, এ আমি এখন থেকেই বলে রাখছি।'

'অপমান'! এই প্রথম আনন্দের মুখে এক ঝিলিক হাসি দেখতে পেল বিরজা। যুগযুগান্তরের বিপ্লব-তীর্থ হচ্ছে এই পুরী। মানুষের গড়া ধর্মের নামে সমস্ত সামাজিক অন্যায় আচরণের মূর্ত প্রতিবাদ স্বরূপ এই একটিমাত্র তীর্থ ই সারা ভারতে আজও সমুন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে কিছুতেই কার অপমান হয় না অত তাড়াতাড়ি। পুরীতে একই হাঁড়ি থেকে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণ খায় মহাপ্রসাদ বলে, তাতে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অপমানিত বোধ করে না। পুরীতে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, রথযাত্রা বা নবকলেবরে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার শ্রীঅঙ্গের সেবা এবং পূজার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত তারা সবাই আদিবাসী শবর সর্দ্দার বিশ্বাবসুর বংশধর, কেউ-ই ব্রাহ্মণ নয়। কিন্তু তবু তাতে সনাতন পূজাপদ্ধতির অপমান হয় না একটুও। এখানে শ্মশ্রুধারী গুরু নানককে যবন মনে করে ভ্রমবশে মন্দির থেকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছিল যখন বড়দেউলের দ্বার-রক্ষকরা, তখনও গুরু নানক কিন্তু নিজেকে অপমানিত ভেবে পুরী ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কথা মনেও স্থান দেন নি একটিবারও। এই পুরীতেই তখনকার দিনেও বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা আয় ছিল যার বাবার, সপ্তগ্রামের ধনাঢ্য পিতার একমাত্র সন্তান সেই রঘুনাথও দুই তিন দিনের পচা প্রসাদান্ন, যা গরুদের খাওয়ার জন্য ফেলে দেওয়া হত সিংহদ্বারের পাশে, তাই তুলে নিয়ে জল দিয়ে ধুয়ে, মাসের পর মাস কেবল সেই গলিত বিকৃত অন্নেই নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছেন অবিচলিত চিত্তে। তবু তার জন্যে লক্ষপতির পুত্র-বক্ষ অপমানে বিদীর্ণ হয়নি যে কখনও, সে কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজই লিখে গেছেন তাঁর চৈতন্য চরিতামৃতে। আর সেই পুরীতেই আপনি

বলছেন, আমার মৎলবের কথা কেউ জানতে পারলে আমার অপমানের নাকি আর সীমা পরিসীমা থাকবে না। কিন্তু যে রহস্য ভেদ করতে সংকল্পবদ্ধ আমি তার কথা তো কিছু মানুষের কাছে বলতেই হবে আমাকে নইলে কেমনভাবে হবে আমার কার্য্যসিদ্ধি? লক্ষ্য যখন স্থির করে ফেলেছি একবার তখন সে লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে আসে যদি বাধা, আসে অপমান, তবে সেই বাধা, সেই অপমানই আমাকে উৎসাহ জোগাবে, প্রেরণা দান করবে, সিদ্ধির পথে আরও এগিয়ে যেতে—এই আমার বিশ্বাস।

আশ্চর্য্য সুন্দর কথা বলতে পারে তো ছেলেটা! বিরজার বিস্ময়ে মুগ্ধতার ছায়াপাত। কী যেন আছে ওর গলার স্বরে, ওর বচন ভঙ্গিমায়, যা শুনে শুনতে ইচ্ছা হয় আরও, বিশ্বাস করতে মন চায় সহজেই।

'আমার বিশ্বাসটা কিন্তু উল্টোগান গাইতে চাইছে গোঁসাই।' ভ্রূ উঁচিয়ে চোখ ছোট করে, টেনে টেনে কথা কইল এবার তিলক-শোভিত ভদ্রলোক; অতএব তোমার মত লোকের সঙ্গে সব সম্পর্ক কেটে দিলাম আমি এই মুহূর্তেই। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা মানেই পুরীতে গিয়ে নিজের বিপদটাকে ডেকে আনা। কী সব সর্বনেশে কথা। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানকে সন্দেহ করা? আমার নাম বাপু শান্তিপ্রিয় সেন। চিরদিন শান্তিই আমার প্রিয়। কোনও ঝুট্‌ঝামেলার মধ্যে আমি নেই, এই আমার সিধা সাফ কথা। এই বলেই শান্তিপ্রিয় সেন তড়াক করে এক লাফে আবার ওপরের বার্থে উঠে টান হয়ে শুয়ে পড়ল চোখ বুঁজে। কামরার আর তিনজোড়া চক্ষু যে তার এই প্রকার অদ্ভুত আচরণে কতটা অবাক হল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই যেন তার মনে হল।

॥ দুই ॥

পুরীতে পৌঁছে যে আশ্রমে আশ্রয় নিল আনন্দ সেটি স্বর্গদ্বার মহাশ্মশানের একেবারে পাশেই। আশ্রম দেখাশুনা করার দায়িত্ব-ভার যে সন্ন্যাসীর ওপর তাঁর নাম স্বামী চিন্ময়ানন্দ গিরি। বয়স ষাটের ওপর কিন্তু তেজ তাঁর যে কোন যুবকের চেয়ে কম নয়। মানুষটি খুব লম্বা নন কিন্তু নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী। আনন্দের পুরীতে আসার উদ্দেশ্য যেদিন জানতে পারলেন সহুঙ্কারে সেদিন জানালেন ইতিহাসের সত্যকে জানতে হবে চোখের ঠুলি খুলে রেখে। কোন সংস্কার বা ভাব-প্রবণতার চশমার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি ফেলে আর যাই দেখতে পাও না কেন সত্যকে খুঁজে পাবে না কখনও। এই বলে স্বপাকাহারী বিদ্বান সন্ন্যাসী ষ্টোভের ওপর থেকে ফুটন্ত খিঁচুড়িটা নীচে নামিয়ে রেখে পুনশ্চ বললেন, 'কিন্তু এ যে বড় কঠিন কাজ ভাই। একা নামছ এত বড় কাজে সফল হবে তো শেষ পর্যন্ত।'

সশ্রদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল আনন্দ—'আপনি সদাচারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন আমি যেন সফল হই।'

আরে দূর বোকা! আমি কি আশীর্বাদ করব, আশীর্বাদ করবেন আমাদের পরমারাধ্যা মা। তবে একটা interesting যোগাযোগের কথা তোমার কানে কানে শুনিয়ে রাখি। যে সিলেট থেকে অদ্বৈতাচার্য এসেছিলেন শান্তিপুরে, নবদ্বীপে এসেছিলেন নিমাই-এর পিতা জগন্নাথ মিশ্র বা পুরন্দর, সেই সিলেটই যে

আমার জন্মস্থান। আবার যে তোমাকে চিঠি লিখেছে বললে সেই নীহার রঞ্জনেরও সিলেটের সঙ্গে সম্বন্ধটা বড় কম ঘনিষ্ঠ নয়, বুঝলে?' বলে মুণ্ডিত মস্তক চশমাপরিহিত সুগৌর প্রবীণ চিন্ময়ানন্দ প্রাণ খুলে হো হো করে হাসতে লাগলেন আশ্রমের অলিন্দকে সচকিত করে দিয়ে।

আশ্রমের অপর একজন বাসিন্দা তারাপ্রসন্ন লাহিড়ীও উৎসাহিত করলেন আনন্দকে। বললেন—নীহারবাবু বলছেন চৈতন্যদেবকে গুমখুন করা হয়েছিল তুমি বললে। ধর তাই যদি করা হয়ে থাকে তবে আজ চারশ চুয়াল্লিশ বছর পরে সে খুনের কিনারা তুমি পাবে কোত্থেকে। চারদিন আগে যে মানুষটা খুন হচ্ছে আজকাল তার খুনেরই কোন কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ শতচেষ্টা করেও। আর এত প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর আগেকার তামাদি হয়ে যাওয়া মামলা। ক্ষণেকের জন্য নীরব থেকে ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটিয়ে শেষে আবার কথা কইলেন বাগ্‌দাদ বসেরা মেসোপটেমিয়া থেকে ঘুরে আসা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-ফেরতা যোগ-সাধক তারাপ্রসন্ন। বললেন—'নেভার মাউণ্ড, বেটার লেট্ দ্যান নেভার। চেষ্টা কর।'

রাত্রে নিজের ঘরে একাকী বসে এইসব কথাই ভাবছিল আনন্দ। ভাবছিল, ছেলেবেলায় মা যখনই নিমাই-এর সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করার মুহূর্তটি বর্ণনা করতেন বাগেরহাটের সেকেণ্ড মুনসিফ্ কোয়ার্টারের বারান্দার ইজিচেয়ারটায় বসে তখন প্রতিবারই কী নিদারুণ ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠ্‌ত আনন্দের শিশু বুকের ভেতরটা। কতদিন উদ্গত ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে ব্যাকুল হয়ে মা'র অধরোষ্ঠে তার ছোট্ট কচি হাতখানি চেপে ধরে চীৎকার করে উঠেছে সে—'আর বোল না মা। আর বোল না।' তবু পরের দিন সন্ধ্যায় সেই নিমাই-সন্ন্যাসের কাহিনীই মার

মুখ থেকে আবার না শুনতে পেলে কিছুই যেন ভাল লাগত না তার।

বাগেরহাট থেকে বাবা বদলী হলেন ঢাকায়। সেইখানেই প্রথম কেনা হ'ল গ্রামোফোনের জন্যে নিমাই সন্ন্যাস পালা। সে পালার সব গান, সব কথা যেন কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল আনন্দর। আবার সেই পালা শুনেই একদিন হঠাৎ কি হল ভরা জ্যৈষ্ঠের কাঠফাটা দুপুরে হাকিমের ছেলে আনন্দ খালি গায়ে, খালি পায়ে, একখানি মাত্র হাফপ্যান্ট পরে সবার অলক্ষ্যে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ী থেকে পীচঢালা লক্ষ্মীবাজারের রাস্তার ওপর কচি কচি পা ফেলে মাত্র সাত বছর বয়সে। কেন যে সে বেরিয়ে গিয়েছিল তা কি সে বুঝতে পেরেছিল সেদিন! চাপরাশী আর্দালীর দল সারাদিন সারা শহরে খুঁজে শেষকালে এক শ্মশানের পাশ থেকে যখন উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল মুনসিফ তনয়কে, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেক আগেই।

আজ আবার কি শৈশবের সেই নিমাই সন্ন্যাস পালার বিচ্ছেদ বেদনাতুর স্মৃতিই নীহারবাবুর পত্রের ঐ নিষ্ঠুর ছত্রের বেত্রাঘাতে সজাগ হয়ে উঠে। এমন ঘর-ছাড়া করে টেনে নিয়ে এসেছে আনন্দকে চৈতন্যের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কাভিনয়ের পটভূমি—এই নীলাচলে?

দরজার অদূরে শাড়ীর খস্‌খস্‌ এবং গহনার ঠুং ঠাং আওয়াজ শুনে চিন্তাচ্ছন্নতা থেকে উঠে এল আনন্দ। চেয়ে দেখল দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন এক সধবা বৃদ্ধা। চোখে চোখ পড়তেই উনি হাত নেড়ে ডাকলেন ইসারায়। পাশে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন নিজেই। তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন চিন্ময়ানন্দজীর কাছে জানতে পারলাম তোমার কথা। তাই তোমাকে ডেকে এনেছি আমার ঘরে। ঐ যে আসনে বসে আছেন আমার গোপালজী। ওঁরই সামনে বসে তোমায় গোপনে

হুটো কথা জানিয়ে রাখি বাবা। হয়ত এতে তোমার কাজের কিছুটা সুবিধা হবে।

বলুন। পলকে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল আনন্দের মন।

আমি প্রায় ষোল বছর হ'ল প্রতি শীতকালে পুরীতে এসে পাঁচ মাস থাকি। হাঁপানি আছে কিনা। আমায় এখানে অনেকেই চেনে আমিও সম্পর্ক রেখে চলি অনেকের সঙ্গে। তা আমার যে পাণ্ডা আছে সে অনেকবারই আমাকে বলেছে—ওদের পরিবার নাকি বংশপরম্পরায় শুনে আসছে যে আমাদের নবদ্বীপের গৌরহরিকে মন্দিরের মধ্যেই মেরে ফেলে কারা পুঁতে ফেলেছিল।

কোন মন্দিরের মধ্যে ?

জগবন্ধুর, আবার কার !

আপনার পাণ্ডার নাম কি ? পারেন কালই একবার আমার তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে ? উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠছে আনন্দ।

কিন্তু সে যে আরও একটা কথা আমাকে প্রায়ই শোনায় কানে কানে।

কী সে কথা ?

পাণ্ডাজী প্রায়ই বলে—এসব কথা আপনি যেন কাউকে আবার বলতে যাবেন না মা। আমি এমন কথা বলছি যা শুনলে পুরীতে আমার আর বাঁচবার উপায় থাকবে না।

তাই নাকি ? তবে—তবে আপনার পাণ্ডার সঙ্গে আমার দেখা হবে না মাসিমা ?

স্নেহছল্‌ছল্‌ চোখে বললেন আশালতা দেবী। হবে বাবা নিশ্চয়ই হবে। তুমি যে দেখতে একেবারে আমার ছোট ছেলেটির মত। তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই যে আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তোমার জন্য কিছু করতে।

সপ্তাহ পরে এক দিন প্রত্যুষে সমুদ্রের ধারে পরিচয় ঘটে গেল

প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এক মুণ্ডিত কেশ আফ্রিকানের সঙ্গে। নাম রিচার্ডস সিরিল লাঙ্গু প্রভু (Richards Cyril Lwangu Prabhu)। হরেকৃষ্ণ মুভমেণ্টে যোগ দিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছে তাই নামের শেষে প্রভু জুড়েছে। বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি হবে না। অনর্গল গীতার শ্লোক মুখস্থ বলে যদিও অপটু উচ্চারণে। নাকের ডগা থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত তিলক। হাতের থলিতে জপের মালা। শ্রীগৌরাঙ্গের আঠারো বছরের লীলাস্থল নীলাচল সম্বন্ধে আগ্রহের সীমা নাই তার।

আনন্দ এর পূর্বে শ্বেতাঙ্গ বৈষ্ণব দেখেছে বেশ কয়জন কিন্তু আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গকে এই প্রথম দেখল সে পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবরূপে। শ্রীল ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নাম করতে শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কপালে হাত ঠেকায় সসম্ভ্রমে। বলল —জান, আমি স্বেচ্ছায় সাজা গ্রহণ করেছি শ্রীচৈতন্যের দেওয়া দণ্ড। অবাক হয়ে প্রশ্ন করল আনন্দ, সেকি? শ্রীচৈতন্যের দণ্ড? কিছু অপরাধ করেছিলে বুঝি?

অপরাধীর ভঙ্গিতে আফ্রিকান জবাব দিল—তা তো করেই-ছিলাম। গ্রামে একটা গরীব মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে রেখেছিল আমার বাবা-মা, আমিও সেই মেয়েকে কথা দিয়েছিলাম আমি তাকেই বিয়ে করব। কিন্তু শহরে পড়াশোনা করতে গিয়ে ভালবেসে ফেললাম এক ধনীর দুলালীকে, গ্রামের মেয়ের দিকে আর ফিরেও তাকাই নি তারপর। চার বছর পর দেশে ফিরে শুনলাম গ্রামের সেই গরীব মেয়েটা বছরের পর বছর কেঁদে কেঁদে, না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, শুকিয়ে শুকিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বলতে বলতে নিজের দুই চোখ বাঁ হাতের চেটোতে ঢেকে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সে। শেষে অশ্রু ভরা দুই চোখ তুলে বাষ্পরুদ্ধস্বরে থেমে থেমে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় আবৃত্তি করল—

চৈতন্যের দণ্ড মহাস্ফূর্তি সে পায়।
যাঁর দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠলোকে যায়॥
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়।
সেই দণ্ডে তার প্রেম ভক্তিযোগ হয়॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ, ২১।৭৯)

আনন্দের সর্বাঙ্গ মুহূর্তে শিহরিত হয়ে উঠল এক অব্যক্ত পুলকে অভারতীয় এক আফ্রিকানের জিভে চৈতন্যভাগবতের বাংলা শ্লোক শুনে।

রিচার্ডস্ বলেই চলল—দণ্ড কি নিয়েছি জানো? মদ, মাংস, মাছ সব ছেড়েছি। বড়লোকের সেই মেয়েটির বার বার হাতছানিতেও আর কখনও ফিরে যাইনি শহরে। স্থির করেছি আমরণ অবিবাহিতই থাকব।

'খুবই কঠিন দণ্ড তুমি মাথা পেতে নিয়েছ ভাই।' সহানুভূতি ফুটে উঠল আনন্দের স্বরে।

এখন চৈতন্য দয়া করে আমাকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন কিনা তিনিই জানেন। এরপর বেশ কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে বসে থাকল আফ্রিকান। চোখে তখনও জলের ধারা শুকোয় নি। মিনিট কয়েক এমনিভাবে থেকে হঠাৎ দৃষ্টি তুলে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা, পুরীতেই তো চৈতন্যের মৃত্যু হয়েছিল?'

অকল্পিতপূর্ব এই প্রশ্নের আকস্মিকতায় বেশ চমকে উঠল আনন্দ। চমকানির বিহ্বলতাটুকু কেটে গেলে সে বলল—'মৃত্যু হয়েছিল কি না তা এখনই আমি বলতে পারব না ভাই। তবে পুরীর মাটিতেই যে তাঁর জীবনাবসান ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

চোখ মুছে রিচার্ডস পুনশ্চ প্রশ্ন করল—'তোমার কথার মানে তো পরিষ্কার হল না আমার কাছে! মৃত্যু আর জীবনাবসান কি আলাদা?'

এবার একটু না হেসে পারল না আনন্দ। বলল—আমিও তো ঐ একই প্রশ্নের সমাধান পাবার আশা নিয়ে পুরীতে এসেছি ভাই।

এর অর্থ কি? বিস্মিত প্রশ্ন আফ্রিকানের।

আনন্দ পাল্টা প্রশ্ন করল—পুরীতে আসার পর সমাধি দেখলে কার কার?

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখেছি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি দেখেছি। দেখেছি কুলদা ব্রহ্মচারী, ন্যাংটাবাবা আরও অনেকের।

একবারও কি মনে প্রশ্ন জাগেনি তোমার যে শ্রীচৈতন্যের সেবায় স্বয়ং উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রদেব গজপতি নিজের দেহ-মন-সহায়-সম্বল সমস্তই উজাড় করে দিতে সর্বদাই ব্যগ্র ছিলেন, সেই নৃপতির নয়নমণি চৈতন্যের জন্য প্রতাপরুদ্রদেব পুরীর কোথাও কোন সমাধি মন্দির নির্মাণ করান নি কেন?

'আমিও ঠিক এই প্রশ্নই করেছি এখানকার অনেক পণ্ডিত মোহান্তের কাছে। কিন্তু তারা সকলেই আমার প্রশ্ন শুনে চটে গেলেন। বললেন, চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান ছিলেন। তাঁর জীবনের আবার আরম্ভ আর শেষ আছে নাকি? তখন আমি বললাম—ভগবান তো তিনি তাঁর হৃদয়বত্তায় অন্তর-সত্তায়। কিন্তু তাঁর বাইরের সত্তা যে দেহ, তার তো আরম্ভের দৃশ্য ইতিহাসে পাচ্ছি আমরা—তাঁর জন্মলগ্নের সেই অপূর্ব বর্ণনা! তবে তাঁর বহির্সত্তা অর্থাৎ তাঁর পঞ্চভূতে তৈরী শরীরের শেষ মুহূর্তের ইতিহাসটুকুই বা আমরা জানতে পারব না কেন?

রিচার্ডসের মুখে এই যুক্তিবাদী কথাগুলি শুনে বিস্ময়ে পুলকে অভিভূত হয়ে পড়ল আনন্দ। উৎসুক কণ্ঠে সে জানতে চাইল আফ্রিকানের ঐ যুক্তিনির্ভর প্রশ্ন শুনে—পণ্ডিত মোহান্তবর্গ কী জবাব দিলেন?

রিচার্ডস জানাল—তাঁরা ঘৃণায় আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন কেউ। কেউ বা বাঁকা ঠোঁটে টিট্‌কারী কাট্‌লেন—নিগ্রো কি খাঁটি কখনও বৈষ্ণব হতে পারে? আবার একজন একান্তে টেনে নিয়ে গিয়ে উপদেশ দিলেন—বিদেশ থেকে এসেছ, যা দেখছ দেখে যাও, যা শুনছ শুনে যাও। মহাপ্রভুর মৃত্যু হয়েছিল কি অন্য কিছু হয়েছিল তা নিয়ে অত মাথা ঘামাবার চেষ্টা করলে তোমাকে সি-আই-এর চর বলে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হবে এদেশ থেকে, বুঝলে?

কী হৃদয়হীন ব্যবহার এই চৈতন্য চরণে সমর্পিত প্রাণ কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের প্রতি! তার একমাত্র অপরাধ—সে খুঁজে বেড়িয়েছে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের সমাধিটা। জানতে চেয়েছে—সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠের পঞ্চভূতে গড়া পুণ্যশরীরটা কোথায় রাখা হয়েছে কীভাবে।

সারা চোখমুখে অদ্ভুত এক কাঠিন্য এসে গিয়েছিল আনন্দের। কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্যেই। পরম বৈষ্ণব এই সর্বমতসহিষ্ণু যুবকটির অনুতপ্ত স্বর ও সহজ সাবলীল মুখের ভাবের সামনে দাঁড়িয়ে মনের সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত ক্ষুণ্ণতা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল যেন তার। সে বলল—'একরাশ কিম্বদন্তী আর তৈরী করা কাহিনীর বেড়াজালের মধ্য থেকে চৈতন্যের মহাপ্রয়াণের সত্যসমৃদ্ধ ঘটনা-চিত্রটি এবার আমি টেনে বের করবই, যেমন করে হোক।'

কিম্বদন্তী আছে বুঝি অনেকগুলি—গৌরাঙ্গদেবের মৃত্যুকে ভিত্তি করে?

আছে বৈকি! যে চৈতন্যের জন্যে তুমি তাঁর জীবনান্তের চারশো চুয়াল্লিশ বছর পরেও আজ ছুটে এসেছ সুদূর আফ্রিকা থেকে ভারতে, সেই সবার প্রাণের গৌরের দেহ যখন খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও তাঁর দেহরক্ষার পরে, তখনই একের পর এক

কিম্বদন্তীর জন্ম হতে লাগল এক এক জন গৌরাঙ্গ ভক্ত কবি বা লেখকের লেখনীর সূতিকাগারে। একটি মাত্র মহাপুরুষের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এতগুলি আখ্যায়িকা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে রচিত হয়েছে বলে তো আমার জানা নেই।

ঠিক এই সময়ে দেখা গেল শ্মশানের দিক থেকে সহাস্য বদনে সকন্যা সোমনাথবাবু এগিয়ে আসছেন এই দুই আলাপচারী যুবকের দিকে। নমস্কার বিনিময়ের পরে আনন্দ যখন পরিচয় করিয়ে দিল পিতাপুত্রীর সঙ্গে রিচার্ডস প্রভুর, তখন সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার সাড়ে ছফুটি পেশী দৃঢ় আফ্রিকানের পানে তাকিয়ে নিয়ে বিরজা সপ্রভিত স্বরে শুধাল—'ইনি বুঝি বৈষ্ণব ?'

আনন্দ জানাল—কেবল বৈষ্ণব বললে খুব সামান্যই বলা হবে এর সম্বন্ধে। গীতা, শ্রীচৈতন্যভাগবত এর কণ্ঠবাসী, উচ্চারণে জড়তা থাকলেও বাংলা বলতে পারে ও প্রায় আমাদেরই মত।

তাই নাকি ? তবে তো ভালই হল, বাংলাতেই কথা বলা যাবে ওঁর সঙ্গে। বিরজার কথায় মৃদু মৃদু হাসতে লাগল তরুণ আফ্রিকান।

ডঃ চট্টোপাধ্যায় জানালেন—ওঁরা আশ্রমেই গিয়েছিলেন আনন্দের সন্ধানে। সেখানে স্বামিজী বলে দিয়েছেন তাঁদের সমুদ্রের তীরটা দেখতে—যদি পাওয়া যায় আনন্দকে। তাই তাঁরা এদিকে এসেছেন। শেষে জানতে চাইলেন—গত সাত দিনে আনন্দের অনুসন্ধানের কাজ কতদূর এগুল।

আনন্দ বলল—সাত দিনে সে পড়ে ফেলেছে অনেকগুলি গ্রন্থ, দেখা করেছে এ-ব্যাপারে উৎসাহী পুরীর বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ মানুষের সঙ্গে। অবসর প্রাপ্ত জজ শ্রীকালিদাস লাহিড়ী মশায় তাকে বই দিয়েছেন বেশ কিছু, বই দিয়েছেন ডঃ বসন্ত কুমার নন্দ, শ্রীরবীন্দ্র কুমার দাস, অরবিন্দধামের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীপূর্ণচন্দ্র মহাপাত্র, সাহিত্যিক শ্রীবীরকিশোর বারিক, পুরুষোত্তম মঠের

তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, সারস্বত গৌড়ীয় আশ্রমের শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন সাগর আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী শ্রীযোগেশ বিশ্বাস। ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, এমার মঠ পরিচালিত রঘুনন্দন লাইব্রেরী, নলিনী গজপতি লাইব্রেরী—এইসব পাঠাগার থেকেও সাহায্য পাচ্ছে সে যথেষ্ট।

'কিছু পাওয়া গেল কি এত বই ঘেঁটে?' আনন্দের পাশে বালির ওপর বসে পড়ে বিরজা জিজ্ঞেস করল।

পাওয়া যা যাচ্ছে তা তো ore ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যের সঙ্গে পাঁচমিশুলী ধাতুর অ্যাম্যালগ্যাম্। এরই ভেতর থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বের করে আনতে হবে আসল সত্যটাকে।

তা কি সম্ভব হবে ভাবছ? সোমনাথ শুধালেন।

'চেষ্টা তো করে চলেছি, দেখি কী হয়। তবে একটা খুব আশার কথা কি জানেন? উড়িষ্যার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব সস্নেহে আমাকে এব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন পত্র লিখে। মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের ওপর কেন্দ্রাপাড়া কলেজের অধ্যাপক দীপক মিশ্রের লেখা একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠিয়ে দিয়ে অশেষ সহায়তা করেছেন তিনি আমার।

'কি লিখেছেন ডঃ মিশ্র ঐ মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে?' প্রশ্ন করলেন সোমনাথ।

একে একে সব জানতে পারবেন। আজই আমাকে সব বলতে বলবেন না দয়া করে। এখনও আমার কালেক্‌শনই চলছে। এরই মধ্যে ডঃ রমেশ মজুমদার, ডঃ সুকুমার সেন, চৈতন্যরিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের শ্রীমদ্‌ভক্তিকুসুম শ্রমণও চিঠি লিখে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন।

'বাঃ মাত্র সাত দিনে তুমি তো অনেকটাই এগিয়েছ তাহলে,

কি বল ? আনন্দ হাসল একটু। বলল—এগুবার চেষ্টা করছি, এইটুকুই বলতে পারি কেবল।'

এতক্ষণ নীরবেই বসেছিল রিচার্ডস্। এবার সে জিজ্ঞেস করল—কিংবদন্তী অনেক আছে বলছিলে তুমি একটু আগে। তা সে সমস্ত কিংবদন্তী থেকে তোমার ধারণাটা কি জন্মাল—সেটা শুনতে কিন্তু ভারী ইচ্ছা হচ্ছে।

'রোমা রোলাঁ তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থে লিখেছেন – মহাপ্রভু মারা গেছেন এপিলেপ্সিতে। এইরকম একটা সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছেছিলেন মনে হয় এই কারণে যে মহাপ্রভু তার জীবদ্দশার শেষের দিকে কেবলই মুখ ঘষতেন কাশীমিশ্রভবনের গম্ভীরার ভিতে; ফলে প্রায়ই রক্তাক্ত হয়ে যেত তার অনিন্দ্য সুন্দর মুখাবয়ব। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে উন্মাদাবস্থায় ঐ যে ঘন ঘন মহাভাবাক্রান্ত হয়ে তাঁর সংজ্ঞা লোপ—ঐটাকেই বোধকরি রোমা রোলাঁ মৃগীরোগের লক্ষণ বলে ভেবেছিলেন। অথচ বর্তমান গম্ভীরার অন্যতম পুরোধা পণ্ডিত হেমাঙ্গ প্রসাদ শাস্ত্রী ভাগবতভূষণের রচিত গম্ভীরামাহাত্ম্য গ্রন্থে আছে স্বরূপ দামোদর স্বয়ং প্রায়ই দেখতে পেতেন গম্ভীরার মেঝেতে চৈতন্য তাঁর নয়নাশ্রু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ অঙ্কিত করে তারই ওপরে নিজের মুখ ঘষছেন উন্মত্তের মত (শ্রীশ্রীগম্ভীরা মাহাত্ম্য পৃঃ ২৩)। মৃগীরোগী তো ঝট্‌কা অজ্ঞান হয়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকে, খিচুনি আসে তার সর্বাঙ্গে। সে কি কৃষ্ণের ছবি এঁকে তাতে কেবল মুখ ঘর্ষণ করে কখনও ?

মুহূর্তের জন্য থামল আনন্দ। তারপর আবার আরম্ভ করল—চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর সমুদ্রে নিমগ্ন হওয়ার ইঙ্গিত মাত্র দিয়েছেন। এ গ্রন্থে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার একেবারেই স্পষ্ট নন। বরঞ্চ কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি পড়ে এটাই মনে হয় বার বার; ওঁর যেন আরও অনেক কিছু বলার ছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দেহাবসান সম্বন্ধে। উনি বলেছেন—

শেষ লীলার সূত্রগণ, কৈলুঁ কিছু বিবরণ,
ইঁহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়॥

কিন্তু হায়, বিস্তারিত বর্ণনা আর তিনি দিতে পারেন নি কখনই।

সোমনাথবাবু বললেন—লোচন দাসের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল পড়েছ? তিনি কিন্তু লিখেছেন—

চৈতন্যদেব লীন হয়ে গেলেন গুণ্ডিচা বাড়ীতে জগন্নাথ দেবের মধ্যে।

লোচন দাস বলেছেন—

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

বাব্বা! আপনার যে সব কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে দেখছি এরই মধ্যে। বিরজার স্তুতি। আনন্দ কিন্তু চেয়েও দেখল না একবার বিরজার দিকে। সে সোমনাথবাবুর মুখের ওপর চোখ রেখেই বলে যেতে লাগল—কেবল লোচন দাস একথা বলেন নি। বলেছেন প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক উৎকলীয় কবি অচ্যুতানন্দ দাস। এবং তাঁর পরবর্তী দিবাকর দাসও। তাঁরাও বলেছেন ঐ জগবন্ধুর শ্রীমূর্তিতে লীন হয়ে যাবারই কথা। দিবাকর দাসের রচনায় আছে—

এমন্ত ভাবি শ্রীচৈতন্য।
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন॥

(জগন্নাথ চরিতামৃত ২৪৭)

আর অচ্যুতানন্দ বলেছেন শূন্য সংহিতায়,

কলারে কলা মিশিলা নোহিলা
সে বারি।

অর্থাৎ জগন্নাথের কাল অঙ্গে কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্য মিশে গেলেন, তাঁর চিহ্ন পর্যন্ত রইল না আর কোথাও। কিন্তু এও কি সম্ভব?

আপনি সেদিন ট্রেনে যে কথা বলছিলেন ডঃ চ্যাটার্জী। স্পিরিট মিশে যেতে পারে স্পিরিটের সঙ্গে; কিন্তু ম্যাটার হঠাৎ মিলিয়ে যাবে মূর্তির মধ্যে—এ কেমন করে বিশ্বাস্য হতে পারে? দেহটা তো ম্যাটার ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু এখানে একটা কথা বলার আছে আমার। বিরজা বাধা দিয়ে উঠল, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছে আক্ষেপোক্তি করেছিলেন—'আমার সর্বভূত মহেশ্বর পরমতত্ত্ব অবগত হতে না পেরে মূঢ়গণ আমাকে নর-দেহধারী বলে অবজ্ঞা করে।' (৯।১১)। এমনও তো হতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকেও আপনারা ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে তাঁকে সাধারণ এক মনুষ্যদেহী বলে ভুল করে অকারণেই তাঁর লীন হয়ে যাওয়ার বৃত্তান্ততে সংশয় প্রকাশ করছেন।

পিতা এবার জবাব দিলেন কন্যার কথায়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যে একজন দিব্যগুণধর পরম পুরুষ ছিলেন, সেকথা ইতিহাসও তো অস্বীকার করছে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যেরও যাঁরা আরাধ্য ছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাম তাঁদেরও দেহত্যাগের কাহিনীত আমরা জানতে পাই মহাভারত আর রামায়ণ পাঠ করে।

ততঃ শরীরে রামস্য বাসুদেবস্য চোভয়োঃ।
আনিষ্য দাহয়ামাস পুরুষৈ রাপ্তকারিভিঃ॥ ৩১

(মহাভারত মুষলি পর্ব)

(অর্থাৎ, অর্জ্জুন বৃষ্টি বংশের বন্ধু-পরিজনদের নিয়ে সমূহভাবে উদক ক্রিয়া করলেন। কুলস্ত্রীদের নিয়ে প্রেতকৃত্য করলেন। কেবল তাই নয়, রাম কৃষ্ণের শরীরাংশ অন্বেষণ করে আপ্তক্রিয়াতে বিনিয়োগ করলেন বা দাহ করলেন।)

কেন চৈতন্যের দেহত্যাগের কথা তবে জানান হয় নি আমাদের কোন প্রামাণ্য বিশ্বাস্য গ্রন্থে সঠিক ভাবে? বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, মহাবীর, নানক, যীশু, হজরত মহম্মদ—এঁদের সবার জীবনের শেষ

মুহূর্তের কথা লিপিবদ্ধ দেখতে পাই বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকে। দেখতে পাই তাঁদের সকলের দান বা সমাধি। তবে কেন কেবল চৈতন্যদেবের মহাপ্রয়াণ বা দেহের কথা জানতে চাওয়াটাও একটা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে আজও তাঁর অন্তর্ধানের এই সুদীর্ঘ চারশ চুয়াল্লিশ বছর পরেও? আনন্দ তার পূর্ব কথার রেশ ধরে বলতে শুরু করল পুনর্বার। কেবল একজন মাত্র কবি চৈতন্যের মৃত্যু এবং মৃতদেহ সম্বন্ধে আমাদের শুনিয়ে গেছেন কিছুটা বিবরণ যা কিছুটা বাস্তব সম্মত। জয়ানন্দের পিতৃদত্ত নাম ছিল গুইয়া। জয়ানন্দ নামটি গৌরাঙ্গের দেওয়া।

তবে তিনি তো চৈতন্যের কন্‌টেম্পোরারি ছিলেন—রিচার্ডস বলল।

হ্যাঁ। তিনি তাঁর চৈতন্যমঙ্গলের উত্তর খণ্ডে বলেছেন—

......রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পায়ে আচম্বিতে॥
......চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে তোটায় শয়ন অবশেষে॥
মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥

(চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দ উত্তর খণ্ড পৃষ্ঠা ১৫০)

এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে রথযাত্রার সময় নাচতে নাচতে ইটের আঘাতে জখম হয়েছিল শ্রীগৌরাঙ্গের বাম পা'টা। এই ক্ষতস্থান বিষিয়ে উঠে ভয়ানক যন্ত্রণা আরম্ভ হল ষষ্ঠী তিথিতে। তখন জ্বরের ঘোরে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি তোটা গোপীনাথে। সেইখানেই শায়িত অবস্থায় চৈতন্যদেব চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে। তাঁর মায়া শরীর পড়ে রইল সেই তোটাতেই। সুতরাং শ্রীচৈতন্য যে লীন হননি জগন্নাথের মধ্যে, তাঁর যে সেপ্‌টিক্ ফিভারে বা ধনুষ্টঙ্কার জাতীয় রোগে মৃত্যু হয়েছিল এবং মৃত্যুর পরও তাঁর মরদেহ যে

পড়েছিল তোটা গোপীনাথেই সেটুকু স্পষ্ট ভাবেই এবং তখনকার দিনেও বেশ সাহসিকতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে গেছেন কবি জয়ানন্দ—একথা মেনে নিতেই হবে। কিন্তু তিনি বলেন নি যে পরে সেই মৃতদেহের কি হল। সেটি কি দাহ করা হল না সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হল নাকি সমাধিস্থ করা হল।

রিচার্ড মন দিয়ে আনন্দের প্রতিটি কথা শুনছিল উৎসুক দুই চোখ মেলে। এবার সে প্রশ্ন করল—তবে কি তুমি জয়ানন্দর বর্ণনাকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছ?

গ্রহণ বা বর্জন আমি কোনটাই করিনি এখনও। আমি একটু আগেই ডঃ চ্যাটার্জীকে বলেছি, এখন চলছে শুধু আহরণ। কোনটা গ্রহণীয় কোনটা বর্জনীয়, তার বিচার হবে আরও পরে এখন নয়।

॥ তিন ॥

পুরীর সুপ্রসিদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম বাসন ব্যবসায়ী দেবেন্দ্র মহান্তি বয়সে যুবা হলেও কৃষ্ণভক্তি ও সেবাপরায়ণতার জন্য তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়। দুধওয়ালা ধর্মশালার বিপরীত দিকে গ্র্যাণ্ডরোডের ওপরে বিরাট দোকান। বাসস্থান গুণ্ডিচা বাড়ীর ঠিক সামনেই। প্রভাতে দিনের কাজ আরম্ভ করার আগে নগ্নপদে কেবলমাত্র একটি গরদবস্ত্র পরিধান করে যান বড়দেউলে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে। সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান পুরুষ। মন্দির থেকে পাওয়া চন্দনের কোঁটা কপালে তাঁর জ্বলজ্বল করে সারাদিন। হরিদাস মঠ, গম্ভীরা প্রভৃতি স্থানে তাঁর প্রভাব যথেষ্ট। সেই দেবেন্দ্রবাবুই পরিচয় করিয়ে দিলেন আনন্দকে রাধাকান্ত মঠের অন্যতম প্রধান সর্বজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীহেমাঙ্গ প্রসাদ দাস শাস্ত্রী ভাগবতভূষণের সঙ্গে। মেদবহুল দেহেও লাবণ্য আজও রয়েছে তাঁর অশীতিপর বয়সে। সম্ভ্রান্ত হাবভাব কথাবার্তা।

দেবেন্দ্রবাবু পরিচয়টুকু করিয়ে দিয়েই স্কুটারে চেপে চলে গেলেন ডেলাং-এ তাঁর ব্যবসার কাজে।

রাধাকান্ত মঠগৃহের একপ্রান্তে দোতলার কোণের ঘরে হেমাঙ্গ পণ্ডিতের আবাস। খাটের ওপর অর্ধশায়িত অবস্থায় অদূরে চেয়ারে বসা আনন্দের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহোদয়। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—গম্ভীরার ইতিহাস জানা আছে?

বিনম্রভাবে উত্তর দিল আনন্দ—যা জানি তা কিছুই নয়। আপনার মুখ থেকে কিছু শুনবার ইচ্ছাতেই আসা।

এই রাধাকান্ত মঠটি আসলে ছিল গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের রাজ পুরোহিত কাশী মিশ্রের বাসভবন। এই যেখানে আমি আজ শুয়ে আছি হয়ত সেখানেই কাশী মিশ্রও শয়ন করে গেছেন সুদূর অতীতে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন রাজ পুরোহিতকে গিয়ে জানালেন যে রাজা নিজে পরামর্শ দিয়েছেন চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষে নীলাচলে ফিরে এলে তাঁকে কাশী মিশ্রের ভবনে থাকবার ব্যবস্থা করতে। তখন উৎফুল্ল হয়ে মিশ্র বলেছিলেন—

......আমি বড় ভাগ্যবান।
মোর গৃহে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥

তারপর যেদিন মহাপ্রভু সত্যিই এলেন, সেদিন—

কাশী মিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিতে আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥

ভেবে দেখ তাহলে এবার, যে কাশী মিশ্রের পদসেবা গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব স্বয়ং নিত্য এসে করতেন, সেই কাশী মিশ্র সেদিন লুটিয়ে পড়ল দিব্য-কান্তি দিব্য-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শ্রীপাদপদ্মে। কী অপূর্ব সে দৃশ্য! বলতে বলতে বেশ কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন পণ্ডিত। খাট থেকে নেমে ইসারায় আনন্দকে সঙ্গে আসতে বলে তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন গম্ভীরা গৃহটির সামনে। অখণ্ড নাম সংকীর্তন চলছিল একাধারে। উনি দেখালেন—চৈতন্যব্যবহৃত কমণ্ডলু, কন্থা এবং খড়ম জোড়া। বললেন—এই যে কাষ্ঠ পাতুকা দেখছ, এ তুটি পাঠিয়েছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া নবদ্বীপ থেকে। ভক্তবৎসল গৌরহরি শ্রীজগদানন্দের অনুরোধে পদসংলগ্ন করেছিলেন এই পাতুকাযুগলে শেষ পর্যন্ত। চৈতন্য চরণস্পর্শে ধন্য এই পাতুকাকে প্রণাম কর। আনন্দ মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় মাথা ঠেকাল ঐ পাতুকায়।

এরপর কাঁচের বাক্সে রক্ষিত কন্থাটি দেখালেন হেমাঙ্গ পণ্ডিত। বললেন—এই কাঁথাটি শচীদেবী নিজের হাতে নতুন বস্ত্রে তৈরী করে পাঠিয়েছিলেন। এ কাঁথাটি চৈতন্য আশীর্বাদধন্য শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী সযত্নে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে দর্শনার্থীদের লোলুপতা ও ব্যাকুলতায় সেই মস্ত লম্বা-চওড়া কাঁথা দিন দিনই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। শেষে যখন শ্রীগোপালগুরুর অধঃস্তন চতুর্দশ আচার্যপাদের সময় দেখা গেল সেই কাঁথার আকার দাঁড়িয়েছে মাত্র একহাত প্রমাণ, তখন নিরুপায় হয়ে এই অমূল্য সম্পদের অবশেষটুকু রক্ষা করার চেষ্টায় এটিকে কাঁচের বাক্সে আশ্রয় দেওয়া হল। একটু থেমে কমণ্ডলুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে পুনশ্চ জানালেন পণ্ডিত মহোদয়—এই করোয়া বা কমণ্ডলু পণ্ডিত জগদানন্দই এনে দিয়েছিলেন মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল থেকে। এই তিনটি পরম ধনকেই নিত্য আমি প্রণাম করি।

আনন্দ মাঝের ছোট্ট কক্ষখানি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল—আর, ঐ তো সেই ঘর—যেখানে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়ে গেছেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু?

'হ্যাঁ। একেই সকলে বলে গম্ভীরা। উৎকল সাহিত্যে গম্ভীরি শব্দের অর্থ—নির্জন ক্ষুদ্র গৃহ। মিশ্র ভবনের এই গবাক্ষ-হীন প্রায়ান্ধকার কক্ষখানিই মহাপ্রভু স্বয়ং বেছে নিয়েছিলেন নিজের থাকার জন্যে। সন্ন্যাস জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনার কত বড় দৃষ্টান্ত একটি এটা। উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্র সদাসর্বদা যাঁর পদরজ নিতে ব্যাকুল, রায় রামানন্দের মত প্রতাপান্বিত শাসনকর্তা যাঁর চরণাশ্রয় পেয়ে কৃত-কৃতার্থ—তিনি নিজে কিন্তু পড়ে থাকতেন এই অন্ধকার গম্ভীরার মেঝেতেই। বক্রেশ্বর পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর, রঘুনাথ গোস্বামী, গোবিন্দ এরা সবাই ছিলেন মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার অন্তরঙ্গ পার্ষদ। এই ছোট্ট ঘরখানির মধ্যেই—

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥

এরপর যখন শুরু হল শ্রীচৈতন্যের মেঝেতে প্রচণ্ড ভাবে মাথা-মুখ ঘর্ষণ, তখন ভীত সন্ত্রস্ত স্বরূপ, গোবিন্দ আহার: নিদ্রা পর্যন্ত ভুলে গেলেন নিজেদের। গোবিন্দ বললেন—

গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিতে মুখ শির ঘষি ক্ষত হয় সব॥

ওদিকে, রাত্রির নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে রক্তলিপ্ত কপাল আর ঠোঁট নিয়ে প্রেমে পাগল প্রভু আমাদের তখন গম্ভীরার মধ্যে গেয়ে চলেছেন—

হা হা কৃষ্ণ! প্রাণধন! হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্য সদ্‌গুণ সাগর!
হা হা শ্যামসুন্দর হা হা পীতাম্বর ধর!
হা হা রাসবিলাসী নাগর!
কাঁহা গেলে তোমা পাই কহ তুমি তাঁহা যাই!

গলিত কাঞ্চন দেহ বর্ণের সঙ্গে অশ্রু আর রক্তের ধারা মিশে একাকার হয়ে গেছে গৌরাঙ্গ সুন্দরের তবু ব্যাকুল কণ্ঠে বিলাপ থামেনা তাঁর—

কাঁহা গেলে তোমা পাই, কহ তুমি তাঁহা যাই।

সে কি মর্মন্তুদ হৃদয়বিদারী দৃশ্য! কথাগুলির শেষের দিকে হেমাঙ্গ পণ্ডিতের গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল বার বার। মস্ত দুই আঁখির কোল বেয়ে নামল নিঃশব্দ ভক্তি অশ্রুর অবিরাম স্রোত।

কিন্তু ঠিক এই রকম একটা সকরুণ মুহূর্তে, সহসা হাসি এসে গেল আনন্দের। হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার—মহাপ্রভুর এই

স্বর্গীয় কৃষ্ণবিরহোচ্ছ্বাসকেই ফরাসী দার্শনিক রোমা রোলাঁ কিনা ভেবেছিলেন মৃগী রোগীর হাত-পা ছোঁড়া বলে !

দোতলায় নিজের কক্ষে হেমাঙ্গ পণ্ডিত যখন আনন্দকে নিয়ে আবার ফিরে গেলেন তখন বেলা তিনটে বেজে গেছে। চারটের সময় পণ্ডিত মহোদয় যান সত্যানন্দ আশ্রমে ভাগবত পাঠ করতে রোজ। একথা পূর্বাহ্ণেই দেবেন্দ্র মহান্তি শুনিয়ে রেখেছিলেন আনন্দকে। কিন্তু হেমাঙ্গের দিক থেকে কোনো তাড়াহুড়োর চিহ্ন পর্যন্ত না দেখতে পেয়ে সে একটু আশ্চর্যই বোধ করল। পণ্ডিত পুনরায় তাঁর শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে শুধালেন—'এখন বল চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কি রকম ?'

আনন্দ সবিনয়ে জ্ঞাপন করল—আজ্ঞে আমার নিজস্ব কোন ধারণাই এখন দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। তাই আপনার কাছে এসেছিলাম এ বিষয়ে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনবার আশায়। আচ্ছা, পঞ্চভূতে তৈরী মনুষ্যদেহ কি কখনও জগন্নাথ মূর্ত্তির মধ্যে লীন হয়ে যেতে পারে ?

স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন হেমাঙ্গ—পারে না এমনটিই বা তুমি বলবে কেমন করে ? সিদ্ধ পুরুষ যাঁরা তাঁদের মত হচ্ছে—দেহ সিদ্ধ বা শুদ্ধ যদি হয়, তাহলে সে-দেহ কখনই কালের গ্রাসে পতিত হতে পারে না। জরা আর মৃত্যু থেকে দেহকে মুক্ত করাই যে দেহ-সিদ্ধির তাৎপর্য। অবশ্য অতি অল্প মানুষই দেহসিদ্ধি লাভ করতে পারে।

'এমন সিদ্ধদেহ পুরুষকে কখনও কি দেখেছেন ?' আনন্দ শুধাল।

দেখি নি। তবে বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থে পড়েছি ওঁদের কথা। গোরক্ষনাথ, জলন্ধরনাথ সিদ্ধ দেহ লাভ করেছিলেন। তিব্বতীয় সাহিত্যে চুরাশী জন সিদ্ধাচার্যের বিবরণ আছে। এই সিদ্ধাচার্যদের নাম ভারতীয় গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে। হঠযোগীরা বায়ু ও

বিন্দু জয় করে দেহ সিদ্ধ হন। রসায়নবিদরা পারদকে আঠারো সংস্কার দ্বারা শোধিত করে তার দৈহিক প্রয়োগ দ্বারা দেহ-সিদ্ধি লাভ করে থাকেন। সহজ পন্থীগণ ভাবসাধনা দিয়ে, মন্ত্রসাধকগণ মন্ত্রবীর্য্য দিয়ে, বাউলগণ চন্দ্রসাধনা দিয়ে সিদ্ধদেহ লাভ করার চেষ্টা করেন। গোপীচাঁদ, ময়নামতী প্রভৃতির কাহিনী দেহসিদ্ধিরই প্রসঙ্গে। এ কাহিনী প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চমৎকার ভাবে লিখিত আছে।

'আপনি চৈতন্যদেবের দেহ সম্বন্ধে তো কিছু বললেন না!'

এবার যেন হেমাঙ্গ পণ্ডিতের কণ্ঠস্বরকে জলদনিনাদের মত শোনাল অনেকটা।

অশীতিপর বৃদ্ধের দুই নয়নের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা আর প্রত্যয়ের দ্বৈত-মূর্চ্ছনা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে চাইছে যেন নিদারুণ আবেগে। তিনি বললেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দেহের চিন্তা তো আমি করি না ভাই। তাঁর ভাব, তাঁর প্রেম, তাঁর সমদর্শিতাকেই কেবল আরাধ্য বলে গ্রহণ করেছি জীবনে। এইগুলিই তো অবিনশ্বর! নশ্বর দেহ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি আছে বল! মুহূর্তের নীরবতার মধ্যে আস্তে আস্তে শয্যার ওপর সোজা হয়ে বসলেন ভাগবতভূষণ হেমাঙ্গ। তারপর পূর্বের জলদগম্ভীর স্বরেই আবার বললেন—

অজাতো জাতবদ্ বিষ্ণুরমৃতো মৃতবত্তথা।
মায়য়া দর্শয়েন্নিত্যমজ্ঞানাং মোহনায় চ॥

ভগবান বিষ্ণু অজ্ঞান ব্যক্তিগণের অজ্ঞানতা মোচনের নিমিত্ত মায়া বলে অজাত হয়েও জাত জীবের ন্যায় এবং অমৃত হয়েও মৃত জীবের ন্যায় আচরণ প্রদর্শন করেন।

॥ চার ॥

গম্ভীরা থেকে অন্যরকম একটা মন নিয়ে আনন্দ ফিরে এলো আশ্রমে। প্রজ্ঞাপ্রবীণ হেমাঙ্গের শেষের কথাগুলি তখনও তার মস্তিষ্কের কন্দরে কন্দরে ধ্বনিত হয়ে উঠছিল উদাত্ত ব্যঞ্জনায়।

কিন্তু নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যার ধাক্কায় নিমেষে গুঁড়িয়ে ধূলিতে পরিণত হল মুহূর্তকাল পূর্বকার তার সেই শান্ত উদাস ভাবটা। দরজার তালা খোলার শব্দ পেয়েই বোধ হয় পাশের ঘরবাসিনী আশালতাদেবী তাড়াতাড়ি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটা আঁটা খাম তুলে দিলেন আনন্দের হাতে। বললেন—এক বৈষ্ণবী এসে চিঠিটা দিয়ে গেছে তোমাকে। বড় ভাল মেয়েটা। যেমন রূপ তেমনি কথাবার্তা। তা বাবা এত অল্প বয়সেই মেয়েটা ভেক নিয়েছে কেন বল তো? বালবিধবা বুঝি? আহা!

খামটার ওপরকার পরিচ্ছন্ন ইংরাজী হস্তাক্ষরের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হতভম্বের মত আনন্দ কথা বলল—বৈষ্ণবী? আমি তো কোন বৈষ্ণবীকে চিনি-না মাসিমা!

'চেনো না? সে কি বাবা? সেই যে রসকলি আঁকা, একটু লালচে চুল!

কই! সেরকম কোন মেয়ের সঙ্গে তো আমার আলাপ হয়নি এখানে এসে।

'সে কি কথা? তা ছ্যাখ না—খামের মধ্যে কি লিখেছে।'

খাম ছিঁড়ে পত্র বের করে পড়ে আনন্দ আরও বেশি অবাক না হয়ে পারল না। গোটা গোটা বাংলা অক্ষরে লেখা আছে—তোমাকে আমার কিছু দেবার আছে। আজ রাত দশটার পর একা রওনা হবে সমুদ্রের তীর ধরে পশ্চিম মুখে। দত্ত ভিলার কাছে আমার লোক অপেক্ষা করবে। সেই নিয়ে আসবে তোমাকে আমার কাছে। যে দুরূহ কাজে তুমি হাত দিয়েছ তাতে সাহসের খুবই প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস এ-বস্তুটি তোমার মধ্যে যথেষ্টই আছে। অতএব নির্ভয়ে চলে এস। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। ইতি। পত্রশেষে পত্র প্রেরকের নাম অনুপস্থিত।

আশালতা বিনা দ্বিধায় আনন্দের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে আলোর কাছে গিয়ে সেটাকে পড়ে নিলেন আগে আগাগোড়া। তারপর বিস্মিত স্বরে জানতে চাইলেন—এর মানে?

মানে তো আমিও কিছুই বুঝতে পারছি নে মাসিমা!

'যাবে নাকি রাত দশটায় ঐ বোষ্টমী ছুঁড়ীটার কাছে?'

একটু ইতস্ততঃ করে আনন্দ বলল—কে যে চিঠি লিখল, কেন যে লিখল…!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠলেন এককালের রিভলভার নিয়ে বৃটিশ পুলিশের হাতে ধরাপড়া অনুশীলন সমিতির বিপ্লবকর্মী আশালতা—লিখবে আবার কে? নিশ্চয়ই ঐ রসকলি আঁকা আধ-ধুমড়ো মেয়েটাই লিখেছে। আর কেন লিখেছে? তাও বুঝছ না? লেখেনি তোমাকে আমার কিছু দেবার আছে? ফুলের মতন দেখতে যার মুখ সেই মেয়ের পেটে এত নোংরামি?

এই বলেই রাগে দুম্ দুম্ করে পা ফেলে মুহূর্তে অদৃশ্য হলেন বৃদ্ধা মহিলা।

রাত সাড়ে ন'টায় পেটে কোন রকমে দুটো ফেলে নানা চিন্তায় মাথা ভারী করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল আনন্দ আশ্রম

থেকে। সাগরের পাড় ধরে হাঁটা শুরু করল পশ্চিম দিকে। বাঁ পাশে উদ্বেলিত তরঙ্গের একটানা প্রার্থনা সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসধ্বনি দক্ষিণে বালুবেলার ওপর ত্রয়োদশীর চাঁদের অবারিত জ্যোৎস্নার শান্ত প্রগল্‌ভতা। ভারী অদ্ভুত লাগছিল আনন্দের এই নিশীথ অভিসারকে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে অতল সমুদ্রের ঐ দুরন্ত তরঙ্গমালা তাদের লক্ষ লক্ষ বাহু তুলে কি প্রার্থনা নিবেদন করে চলেছে শ্রীক্ষেত্রের পুরুষোত্তম ঐ জগন্নাথের কাছে। ওরাও বুঝি পৌঁছতে চায় জগন্নাথেরই রত্নবেদী মূলে তাঁর চরণ কমল স্পর্শাভিলাষী হয়ে! তাই কি এই উদগ্র ব্যাকুলতা?

'এই যে গোবর্দ্ধন গোঁসাই, আমি এখানে!'

মেয়েলি কণ্ঠের তীব্রতায় চমক ভাঙ্গলো আনন্দের। দূরে দৃষ্টি পড়তেই দেখতে পেল ছিপছিপে গড়নের চূড়া করে বাঁধা চুল এক তরুণী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তারই দিকে। কাছে আসতেই ক্ষুব্ধস্বরে আনন্দ বলে উঠল—আমার নাম তো গোবর্দ্ধন গোঁসাই নয়।

'কিন্তু আমাদের প্রভুজী যে তোমাকে ঐ নামেই ডাকতে বলেছেন। তোমার আসল নাম তো আনন্দ বর্ধন। ঐ বর্ধনটাকে গোবর্ধনই যদি করে নিই আমরা তাতে গোঁসাই-এর এত গোসা কেন?' বলে মুচকি হাসতে লাগলো মেয়েটা। একটু পরে পুনশ্চ বলল—এসো আমার সঙ্গে। প্রভুজী দূরে ঐ পুঁটিয়াষ্টেট থেকে তৈরী করে দেওয়া ভজন কুঠিতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

'কে তোমার প্রভুজী?'

একটু পরেই তো দেখতে পাবে। বলে মেয়েটি পথ দেখিয়ে হাঁটতে লাগল আগে আগে।

বালির ওপরেই কাঁটা গুল্মলতা ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে।

খানিকটা ব্যবধানে পর পর অনেকগুলি ইঁটের ছোট ছোট স্তূপের মত দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রশ্ন করলো 'ওগুলো আবার কী?'

'বৈষ্ণবদের সমাধি গো। কেন, ভূতের ভয় আছে বুঝি?' বলেই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল বৈষ্ণবী।

আনন্দ ভাবল—এই মেয়েটিই কি তবে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল আশ্রমে!

পুঁটিয়াষ্টেটের এক ভদ্রলোকের টাকায় অনেক যত্নে বানান ভজন কুঠি এখন ভাঙ্গা-পোড়ো একটা শেয়াল, সাপ আর গাঁজাখোরদের আড্ডায় পরিণত হয়েছে। গোবর্ধন ঠাকুর! ভজন কুঠির দুর্দশা দেখলে দুঃখই হয়।

মেয়েটার ব্যবহারে আন্তরিকতায় এবং গলার স্বরে মিষ্টতা আছে। কিন্তু কোথায়, কার কাছে, কেনই বা যে ও নিয়ে যাচ্ছে তাকে—একথাটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না আনন্দ।

অনতিকালের মধ্যেই তারা দুজনে গিয়ে উপস্থিত হল যেখানটায়, সেখানটায় বিরাট বিরাট গাছে এমনই ঢাকা পড়ে গেছে যে, দূর থেকে দেখে কারুর বুঝবার সাধ্য নাই যে ওখানে আবার দুখানি ঘর সান বাঁধানো আঙ্গিনা, সিংহ-বসানো ফটক এবং সুন্দর ঘাট সিঁড়িতে সাজানো একটি ছোট পুকুরও রয়েছে।

পুকুরটার কাছাকাছি যেতেই আলখাল্লা পরিহিত এক শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত পুরুষ ব্যস্তপদে অগ্রসর হলেন আনন্দের দিকে। মাথায় সাধুদের মত কান-ঢাকা টুপি। একটু যেন রূঢ় স্বরেই আনন্দ জিজ্ঞাসা করল—'কে আপনি?'

'আমাকে এরা প্রভুজী বলে ডাকে।'

আমাকে আপনার কী প্রয়োজন?

'তোমাকে একটা জিনিস দেব বলে ডেকেছি।' এই বলে আলখাল্লার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি ফাউণ্টেন পেন বের করে এনে সেটি তুলে দিলেন আনন্দের হাতে।

এটা নিয়ে আমি কি করব?

'তোমার থিসিস লিখবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধান নিয়ে তুমি যে গবেষণা করছ তারই থিসিস।'

এই কলম দিয়ে?

'Yes! এই কলম দিয়ে। জানো এই ফাউন্টেন পেনে কার স্পর্শ আছে?'

বিহ্বলের মত প্রশ্ন করল আনন্দ—'কার?'

'রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের। Have you heard his name?'

শুনেছি। কিন্তু খগেনবাবুর হাতের পেন আপনি আমাকে কেন—

আনন্দের কথা শেষ হবার আগেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন প্রভুজী—কেন তোমার হাতে আমি দিচ্ছি আজ এই তো? well, যে কাজ ডঃ দীনেশ সেন, রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র শেষ করে যেতে পারেন নি, সেই কাজ আমি শুরু করেছিলাম আজ থেকে ছ' বছর আগে। চৈতন্যদেবের সেই অমৃতময় দিব্য দেহখানির কী হয়েছিল শেষ পর্যন্ত? কী পরিবেশে ঘনিয়ে এসেছিল তাঁর ইহকালের শেষ মুহূর্তটি!

গত ছ' বছর ধরে আপনি এই বিষয়ের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন?

'কেবল চালাচ্ছি না এগিয়েওছি অনেক দূর।' সে সব তোমাকে উজাড় করে দেব বলেই তো এখানে ডেকে এনেছি আজ এমন জঙ্গলের মধ্যে এত রাতে। কিন্তু আমার প্রগ্রেসের কথা শোনার আগে এই কলমটি তুমি সশ্রদ্ধ চিত্তে মাথায় ছোঁয়াও। বালিগঞ্জের মহানির্বাণ রোড আর অশ্বিনী দত্ত রোডের সংযোগ স্থলে রায়সাহেব জিতেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে এক শ্রাদ্ধ বাসরে মাথুর গাইতে গিয়েছিলেন খগেনবাবু, সেখানেই তাঁকে দিয়ে ছুঁইয়ে নিয়েছিলাম

এই কলম। আজ সেই কলম তোমার হাতে দিতে পেরে আমি নিশ্চিন্ত।

আনন্দ সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে উঠতে না পেরেও কেমন যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে শ্রদ্ধাবনত মস্তক ঠেকাল হাতের কলমটায়। আর সেই দৃশ্য দেখে পুলকাতিশয্যে, সজোরে জড়িয়ে ধরলেন প্রভুজী আনন্দকে নিজের সবল বাহুবেষ্টনীর মধ্যে। তারপর বললেন—now, my boy, এখন তোমার দিক থেকে আর একটি কথাও নয়। এখন কেবল আমি বলে যাব তুমি শুনবে। কতদিন আমি অপেক্ষা করেছি তোমার মত একটি শপথনিষ্ঠ যুবকের জন্যে যার কাছে আমার এতদিনের পরিশ্রমে পাওয়া সব মেটিরিয়াল আমি তুলে দিয়ে যেতে পারব। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে নি। আজ তোমাকে পেয়েছি এই চন্দ্রালোকিত নিস্তব্ধ নিশীথ প্রহরে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন আনন্দ। তাই ঠিক এমন এক সময়ে কেবল আমাকেই কথা কইতে দিতে হবে তোমাকে। be patient, তোমার যদি কোন প্রশ্ন থাকে পরে তার জবাব আমি নিশ্চয় দেব। May I start now?

সাগ্রহে আনন্দ বলল—'বলুন।'

প্রভু তাঁর বাঁহাতে রাখা নস্যির ডিবা থেকে একটা বড় টিপ তুলে নিয়ে এবার তাঁর দুই নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন—যে উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এবার পুরীতে এসেছ, অনেক বছর আগে ঐ একই উদ্দেশ্যের তাড়নায় ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন এবং কীর্তন-যাদুকর রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মশাইও আসতে বাধ্য হয়েছিলেন এই নীলাচলে। আলাদা আলাদা ভাবে অনেক অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন তাঁরা। তাঁদের দৃষ্টিও কেবল খুঁজে ফিরেছে ঐ একই প্রশ্ন তুলে—সে কোথায়, সে কোথায়? লক্ষ লক্ষ ভক্তবক্ষ মুহূর্তে উদ্বেল হয়ে উঠত যে দেহের

ভুবন মোহন রূপচ্ছটায়—সে দেহটা কোথায় গেল? কোথায় শুইয়ে রাখা হ'ল সেই স্বর্ণবর্ণ অপাপবিদ্ধ দিব্য তনুকে?

যদিও একটু আগেই প্রভুজী বলে দিয়েছিলেন এখন কেবল আমি বলে যাব তুমি শুনবে, তবু আনন্দ কথা না বলে থাকতে পারল না। বলল—আজ গম্ভীরায় হেমাঙ্গ পণ্ডিত যা বললেন তাতে তো মনে হয়—।

'ব্যস ব্যস, আর বলতে হবে না। Do not forget—হেমাঙ্গ পণ্ডিত সারা জীবন চলে আসছেন ভক্তির পথ ধরে। ভক্তের চোখে ভক্তির যিনি পাত্র তিনি শুধুই ভগবান, তার কম বা বেশি আর কিছুই নন। তাই ভগবানের মৃত্যু হবে আর দশজন মানুষের মত এটা ভক্তপ্রাণ মেনে না নিতে পারলেই যেন খুশী হয়।

একথা আপনার ঠিকই বোধ হয়। তার কারণ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবও ভুবনেশ্বর থেকে তাঁর পত্রে আমায় লিখেছেন—Naturally those who accepted Sri Chaitanya as God incarnate refused to accept his death on account of a disease. This has happened in the case of almost all saints and incarnations. তাছাড়া ভক্তের হৃদয়রাজ্যে তার ভক্তির পাত্রটি যে কালজয়ী অবিনশ্বর - একথা অস্বীকার করার সাধ্য কি কারও আছে? কিন্তু ইতিহাসের সত্যানুসন্ধানের পথটিই যে বড় নিষ্ঠুর। ইতিহাসের প্রধান কাজ হল মাটি খুঁড়ে অতীতের হাড়গোড় টেনে টেনে বের করা। এ কাজে সেন্টিমেণ্টালিজম-এর কোন ঠাঁই নেই। সাধারণ ভক্তিবাদী যারা তারা ঘটনার চেয়ে রটনাকেই বিশ্বাস করতে যেন একটু বেশি ভালবাসে, am I correct?

আনন্দ কেবল হাসল সামান্য। মুখে বলল—তারপর বলুন।

Now let's go back to our old track. খগেনবাবুর মনে সন্দেহ জেগেছিল গৌরাঙ্গদেবের দেহ বোধহয় গুণ্ডিচা বাড়ীর মৃত্তিকাগর্ভে কোথাও না কোথাও সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কিন্তু দীনেশবাবুর প্রত্যয় অন্যরকমের। তুমি কি ডঃ সেনের 'চৈতন্য এণ্ড হিজ্ এজ্' গ্রন্থটি পড়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তবে শোন। দীনেশবাবু তাঁর চৈতন্য এণ্ড হিজ্ এজ্-এর ২৫৯ পৃষ্ঠায় কী লিখেছেন।

তিনি লিখেছেন—For fifty years after the Tirodhan of the great teacher, the vaisnab community lay exervated by the great shock. Their kirthana music which had taken the whole Country by surprise, stopped for a time after that melancholy went and was not heard for nearly half a century in the great provinces of Bengal and Orissa. এখানে ঐ great shock কথাটা লক্ষ্য কর। যাঁর জন্ম হয়েছে তার একদিন মৃত্যু যে হবেই একথা তো সকলেরই জানা। তাতে এমন shock পাবার কী থাকতে পারে যার দরুণ একটা গোটা বৈষ্ণব সম্প্রদায় মহাপ্রভুর পরম প্রিয় কীর্ত্তন গান পর্যন্ত বন্ধ রাখল দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে উড়িষ্যায় এবং বাংলায়? আসলে এই shock এর মুখ্য কারণ গৌরাঙ্গদেবের তিরোধানের সমস্ত ঘটনাটাই ছিল তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের কাছে ভীষণ রকমের আকস্মিক, অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও গম্ভীরার মধ্যে যাঁকে মহাভাবে কীর্ত্তন করতে দেখেছে অনেকেই, তিনিই বেলা চারটে থেকে রাত এগারটার মধ্যবর্ত্তী যে কোন একটা সময়ে হঠাৎ জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তির সঙ্গে মিশে গেলেন—এরকম একটা আজগুবি ব্যাপারকে কোন বাস্তবধর্মী মন কখনও বিশ্বাস করতে

রাজী নয়। আর ঐ যে কীর্ত্তন করা বন্ধ হয়ে গেল অর্দ্ধশতাব্দীর মত ওর মূলে কেবল ট্রিমেণ্ডাস্ শকই ছিল না, ছিল একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক।

আতঙ্ক? কিসের আতঙ্ক?

'ব্যক্তিগত বিপৎপাতের।'

একটু বুঝিয়ে বলুন দয়া করে।

'একটা বিরাট রণক্ষেত্রে আগেকার দিনে, যখন সৈন্যরা শুনতে পেত তাদের রাজা যুদ্ধে নিহত অথবা বন্দী হয়েছে, তখন পদাতিক অশ্বারোহী সেনারা ভয়ে দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটে পালাতে শুরু করত না?'

সে তো মৃত্যু ভয়ে।

'এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেই ধরনেরই একটা ভয়ে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল চৈতন্যদেবের ভক্ত এবং শিষ্যরা যখন জানতে পারল অমিতবীর্য্য দিব্যশক্তিসম্পন্ন মহাপ্রভুকেও লোকচক্ষুর সামনে থেকে চিরদিনের মত সরিয়ে দিয়েছে কোন এক দুষ্ট চক্র। যে চক্র কোনদিনই ভাল চোখে দেখেনি শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমভক্তি আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের সমর্থক, অনুসারী ও পৃষ্ঠপোষকদের। এমন কি তার মরদেহটিকে পর্যন্ত লোপাট করে দিয়েছে ঐ পাপচক্র।'

এসব কি বলছেন আপনি? আপনিও তবে নীহার বাবুর মতই বিশ্বাস করেন যে, চৈতন্যদেবকে হত্যা করা হয়েছিল?

'কেবল বিশ্বাস করি বললেই ইতিহাস তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না। ইতিহাস চাইবে সাক্ষী চাইবে প্রমাণ। আমাকে এ প্রশ্ন না করে তাই তোমাকে চৈতন্যদেবের নীলাচল বাসের ঘটনাবলীর মধ্যেই তথ্য খুঁজতে হবে, প্রমাণ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতে হবে।'

তা হলে আপনি কি বলতে চান পুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত এবং শিষ্যই কেবল ছিল না, শত্রুও ছিল কিছু।

'কিছু কি অনেক, সে কথা বলা কঠিন। তবে বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, নানক এদের কারুরই জীবনে যেমন শত্রুতা করার লোকের অভাব ছিল না, মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেও ঠিক তেমনিটিই দেখা গেছে।'

৯১৬ বঙ্গাব্দের (১৪৩১ শক, ১৫১০ খৃঃ) ২৯শে মাঘ (সংক্রান্তি দিবস) শনিবার পূর্ণিমা তিথিতে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করে রূপান্তরিত হলেন কাটোয়ায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীতে এবং ফাল্গুনে এসে প্রথম পা রাখলেন এই পুরীর মাটিতে।

এরপর বেশ কয় বছর পদব্রজে ভারতের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা শেষে যখন নীলাচলে আবার প্রত্যাবর্তন করে স্থায়ীভাবে তাঁর ভক্তিধর্ম প্রচারের লীলাক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করলেন এই শ্রীক্ষেত্রকে তখন থেকেই অল্পে অল্পে ঈর্ষা এবং সন্দেহের পাত্র হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি অনেকের।

কিন্তু কেন এই ঈর্ষা, কেন এই সন্দেহ এক গৈরিকধারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে?

'এটাই তো স্বাভাবিক। যে প্রদীপ সারা রাত আলো দিয়ে তোমার ঘরের অন্ধকার ঘুচাল সকালে উঠে কখনও কি দেখেছ সেই প্রদীপের বুকটা কেমন জ্বলে-পুড়ে কালো হয়ে গেছে! আলো দিয়ে মানুষের মনের তমসা দূর করবার জন্যে যাঁদের আবির্ভাব, তাঁদের সকলকেই কিছু অজ্ঞান মানুষের অকারণ সন্দেহ, ঈর্ষা, লাঞ্ছনা ও অবহেলার জ্বালা সহ্য করতে যে হবেই হাসিমুখে। রবিঠাকুর তার ভাষা ও ছন্দ কবিতায় বলেন নি—

অলৌকিক আনন্দের ভার, বিধাতা যাহারে দেয়,
তার বক্ষে বেদনা অপার!

চুড়ো করে চুল বাঁধা মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল পলাং বৃক্ষের নীচে এতক্ষণ। একটু এগিয়ে এসে সে এবার জিজ্ঞাসা করল—'কিন্তু প্রভুজী! গৌরসুন্দরের ওপর হিংসা আর রাগের কারণ কি থাকতে পারে?'

প্রভুজী দৃষ্টি ঘুরালেন মেয়েটির দিকে। তারপর বললেন কারণ অনেকগুলিই ছিল মা-মণি। আর সেই কারণগুলির অনেকগুলি চৈতন্যের ভক্ত-শিষ্যরা জানতেন বলেই চৈতন্যের লীন হয়ে যাওয়ার কাহিনী তাদের কেউ অন্তরে বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারে নি। ঐ চৈতন্য-বিরোধী যে কারা সেটাও যে তাঁদের অজানা ছিল না তার প্রমাণ চৈতন্যের অন্তর্ধানের সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যাচারের আশঙ্কায় বঙ্গ-উড়িষ্যায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের জন্যে সংকীর্ত্তন স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। ভক্তদের প্রাণে ভয় হয়েছিল। যে কীর্ত্তন ছিল চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ, সেই কীর্ত্তন যদি তাঁরা এখনও গান তাহলে চৈতন্য-বিরোধী চক্রের খড়্গাঘাত তাঁদের ওপরেও নেমে আসতে বিলম্ব হবে না। এই বলে একটু নীরব হলেন বৃদ্ধ। ডিবার নস্যি পুনশ্চ প্রবেশ করালেন নাসিকাভ্যন্তরে। কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়িটা দেখে নিলেন একবার। তারপর আবার আরম্ভ করলেন—'এইবার শোনো ষোড়শ শতাব্দীর উৎকল বঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রভাবশালী অলোক-সামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী শ্রীচৈতন্য ক্রমে ক্রমে কেমন করে চোখের বালিতে পরিণত হলেন অনেকেরই। প্রথম শত্রুতা শুরু হল অবশ্য স্মার্ত্তদের দিক থেকেই। নীলকণ্ঠ দাস তাঁর ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য নামক পুস্তকে বলেছেন মহাপ্রভু স্মার্ত্তদের দুর্ব্যবহারে একদিন নবদ্বীপ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আবার পুরীতে এসেও তাঁকে স্মার্ত্তদেরই বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় প্রথমেই। নীলকণ্ঠবাবু ঠিকই লিখেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পর পর সাতদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাছে মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করার

পর যেদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আদি শংকরাচার্যের নিন্দা করলেন, বললেন শংকর ভাষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্ত বিরুদ্ধ। বললেন মায়াবাদীগণ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। আমার মনে হয় শংকরানুরাগী স্মার্তরা সেদিন থেকেই বিষ নজরে দেখতে শুরু করলেন সদ্য নীলাচলাগত নবদ্বীপ-জাত বিপ্লবী সেই প্রেমধর্মীকে। এই স্মার্ত পণ্ডিতরাই এর পরে যখন দেখলেন মায়াবাদী স্মার্তচূড়ামণি রাজপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য গৌরাঙ্গের একজন স্তবকারী ভক্তে রূপান্তরিত হলেন। তখন তাঁদের মস্তিষ্কে যে ঈর্ষা ও ক্ষোভের দাবানল প্রজ্বলিত হল তা সর্বগ্রাসী, তা বড়ই ভয়ঙ্কর। এর ওপর আবার রাজ-মহেন্দ্রীর রাজ-প্রতিনিধি প্রবল প্রতিপত্তিশালী ধনাঢ্য রায় রামানন্দ পট্টনায়ক যখন শ্রীচৈতন্যের উপদেশে কৃষ্ণ নাম কণ্ঠে নিয়ে অতবড় সম্মানিত রাজপদও ত্যাগ করলেন হাসতে হাসতে, যখন উড়িষ্যাধিপতি গজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট কলবর্গেশ্বর শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলেন শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণকমলে তখন স্মার্ত সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সারা উৎকলের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং রাজার পরিজনবর্গও মনে মনে আগুন হয়ে উঠলেন চৈতন্যের ওপরে। তাহলে, লক্ষ করছ ক্রমেই মহাপ্রভুর শত্রু কেমনভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল তৎকালীন উৎকলে। যে প্রতাপরুদ্রদেব সম্বন্ধে শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার ১১৮ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে পূর্বে যিনি জগন্নাথদেবের অর্চক মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন তিনিই এখন ইন্দ্রসম ঐশ্বর্যশালী হয়ে প্রতাপরুদ্রদেবরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। যে প্রতাপরুদ্রদেবের রণনৈপুণ্য এবং শৌর্য্যবীর্য্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে রায় রামানন্দ তাঁর জগন্নাথবল্লভ নাটকম্-এ (১ম অঙ্ক, ৫-৭ শ্লোক, শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামী সংস্করণ) লিখেছেন—তাঁর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সেকেন্দর নামক যবনরাজ ভয়ে গিরি-কন্দরে প্রবেশ করেন, গুলবার্গ দেশের (Gulbarga in karnat) রাজা মৃত্যুভয়ে কম্পিত হয়ে নিজ স্বজনবর্গের প্রতি সাশ্রুনেত্রপাত

করতে থাকেন, গুর্জর নৃপতি নিজ রাজধানীকেও অরণ্যের ন্যায় শ্বাপদ সঙ্কুল এবং বিপজ্জনক বলে মনে করেন, গৌড়াধিপতি নিজেকে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ক্ষুদ্র পোতারূঢ় মানুষের মত অসহায় বোধ করেন···ইত্যাদি। যে প্রতাপরুদ্রের সম্বন্ধে গুণ্টুর জেলার ইন্দ্রপুলপাড়ু গ্রামের চেন্না কেশব মন্দিরে গ্রথিত শিলালিপি বলছে—১৫০০ খৃষ্টাব্দেই প্রতাপরুদ্র পরাভূত করেন গৌড়রাজকে এবং ১৫০০ থেকে ১৫০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি অধিকার করেন চন্দ্রগিরি। যে প্রতাপরুদ্র ১৫০৯-এ মান্দারণ দুর্গের কাছে নবাব আলাউদ্দীন হোসেনের সেনাপতি ইস্‌মাইল গাজীকে অনায়াসে পরাস্ত করলেন প্রচণ্ড বিক্রমে অপূর্ব রণকৌশল প্রদর্শন করে, দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর তট পর্যন্ত দখল করে নিলেন—সেই প্রতাপরুদ্রকেই চৈতন্যদেব উপদেশ দিলেন—

কৃষ্ণকার্য বিনা তুমি না করিবা আর॥
নিরন্তর কর গিয়া কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা বিষ্ণুচক্র সুদর্শন॥

(চৈঃ ভাঃ, অ ৫, ২০০-২০২)

প্রতাপরুদ্র নিমজ্জিত হলেন কৃষ্ণভক্তি রসের অর্ণবে। ফলে, একের পর এক দুর্গের পতন হতে লাগল তাঁর। পতন ঘটল উদয়গিরি, কোণ্ডাভিড়ু (kondavidu), অদ্দাংকি, বেনীকোণ্ডা, বেল্লামা কোণ্ডা, নাগার্জ্জুন কোণ্ডা, কোট্টারামা প্রভৃতি কেল্লাগুলির (Further sources of Vijaynagar History Vol. I, P. 201)। এর আগে ১৫১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেব রায় প্রতাপরুদ্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন কোণ্ডাপল্লী, রাজমহেন্দ্রী এবং সিংহাচলম্। রণক্ষেত্রে যতবারই পূর্বকার দিগ্‌বিজয়ী প্রতাপরুদ্রের পরাজয় ঘটতে লাগল, চৈতন্যবিরোধী গোষ্ঠী ততবারই ঐ পরাজয়ের কারণ হিসেবে জনসাধারণের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেই। রটনা করতে লাগল রাজাকে কৃষ্ণপ্রেমে

মাতোয়ারা করে তুলে তাঁর সমস্ত শৌর্যবীর্য নষ্ট করে দিয়েছে কীর্তন সর্বস্ব রাধিকাভাবের সাধক ঐ নবদ্বীপ নন্দনই। বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে আকুল আগ্রহ নিয়ে অসম্ভব স্মৃতিশক্তির অধিকারী এই বৃদ্ধের প্রতিটি কথা যেন গিলছিল নীরবে আনন্দ। এবার সে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল—এই রকমভাবে যে চৈতন্যদেবকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা চলছিল তার প্রমাণ কি কোথাও পেয়েছেন ইতিহাসে?

'নিশ্চয় পেয়েছি! বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন প্রভুজী। আমি তো আগেই বলেছি তোমাকে—ভক্তিরাজ্যে, ভাবরাজ্যে প্রমাণের মূল্য যত কমই হোক ইতিহাসের সাম্রাজ্যে কিন্তু প্রবেশ করতেও পারবে না কেউ তথ্য আর প্রমাণের পাশপোর্ট না দেখিয়ে। বিরোধী পক্ষের ঐ রটনা পাঠ করেই তো পরবর্তী যুগের প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তাঁর হিষ্ট্রি অফ্ ওড়িষ্যাতে (History of Orissa, Vol I. PP 330, 331, 336) চৈতন্যদেবকেই গিল্টি সাব্যস্ত করে নির্মম ভাষায় তাঁর Verdict দিয়েছেন--Chaitanya was one of the principal causes of the political decline of the empire and the people of Orissa. ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাবও ছাড়েননি মহাপ্রভুকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে। তিনি তাঁর হিষ্ট্রি অফ ওড়িষ্যা গ্রন্থের ৩২৯ পৃষ্ঠায় সোজাসুজি বলছেন-- A doctrine that preaches inaction and sentimentalism harmful to the ordinary man in his daily walk of life and it is simply fatal to an administrator who holds the destiny of millions. The attempt to make the Bhakti cult a mass religion and to influence the king and his officers by its sweet pessimistic philosophy had no doubt been fatal to the social and political life of the country

(History of Orissa, Vol I P, 329)। ১৫২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের পুরীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে সেই সময়কার ঈর্ষান্বিত ব্রাহ্মণ ও স্মার্তসমাজের অধিকাংশেরই অন্তরে প্রতাপরুদ্রের রাজত্ব পরিচালনায় অসাফল্যের কারণ হিসেবে মুখ্যতঃ আজকের ডঃ মহতাবের মতই একটি 'অভিমত' ক্রমশঃ সার্বজনীন রূপ নিয়ে দানা বেঁধে উঠছিল এবং এই অভিমত-ই আরও মারাত্মক রকমের ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করল তখন, যখন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রাজ তহবিল-তছরূপকারী রায় রামানন্দ সহোদর মালজ্যাঠা দণ্ডপাটের (মেদিনীপুরের) প্রশাসক গোপীনাথ পট্টনায়ক সসম্মানে মুক্তি পেলেন শ্রীচৈতন্যদেবেরই অনুগ্রহে এবং আনুকূল্যে। রাজ্য শাসন কার্য্যের ওপরেও মহাপ্রভুর এমন অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার লক্ষ্য করে মহামন্ত্রী, অমাত্য, রাজকর্মচারী প্রভৃতি বুদ্ধিজীবি প্রায় সকলেই রোষে এবং আক্রোশে রাজাকে কেমন করে চৈতন্য-প্রভাব জাল থেকে মুক্ত করা যায় সেই কথা গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন।

ওদিকে মন্দিরের পূজারী ও পাণ্ডাদের মধ্যেও একটা অসহিষ্ণুতা ক্রমেই বেশিভাবে ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল। তার কারণ, নবদ্বীপাগত এই সর্বজীবে সমদর্শী ধর্মবিপ্লবী মহাপুরুষটি 'ব্রাহ্মণে দেন আলিঙ্গন আর চণ্ডালে দেন কোল।' সেই যুগের সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ এবং বর্ণ হিন্দুবৃন্দ অস্পৃশ্য বলে যাদের সর্বদাই দূরে সরিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন, সেই নিপীড়িত নিষ্পেষিত মানুষগুলিকেই শ্রীচৈতন্য টেনে নিলেন আপন অঙ্কে পরম করুণা-ভরে। ঘটালেন এক বিশ্বজনীন উদার ধর্মের অভ্যুদয়। এতে সংস্কারান্ধ এবং স্বার্থসন্ধ ধর্মধ্বজীরা যে অচিরেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে তাতে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়!

কিন্তু বৌদ্ধরা? পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর উৎকলে বৌদ্ধের

সংখ্যাও তো খুব কম ছিল না? তারাও কি চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল? জানতে চাইল আনন্দ।

'প্রথমদিকে বৌদ্ধদের সঙ্গে মহাপ্রভুর দু-চারবার তর্কযুদ্ধ হয়েছিল বটে কিন্তু তাতে বৌদ্ধরা তাঁর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে ওঠেনি তখনই। তবে তারাও শত্রু হয়ে দাঁড়াতে খুব বেশি দেরী হল না!'

বৈষ্ণবী যুবতী জিজ্ঞেসা করলেন—কেন প্রভুজী? বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের কি কোন সংঘর্ষ হয়েছিল?

'না মা মণি' সংঘর্ষ ঠিক নয়, হয়েছিল একটা ভুল বুঝাবুঝি। দোষই বল আর ভুলই বল। সেটা করলেন প্রতাপরুদ্রদেব। আর মৎলববাজদের প্ররোচনায় বৌদ্ধরা চৈতন্যদেবকেই মনে মনে সেই দোষ বা ভুলের জন্য দায়ী করে বসল। ব্যাপারটা আসলে প্রতাপরুদ্রদেবের অন্যতমা মহিষীকে নিয়ে। প্রতাপরুদ্রদেবের দক্ষিণ দেশীয় সভাপণ্ডিত লোল্ল-লক্ষ্মীধর রচিত সরস্বতী বিলাস গ্রন্থে (অনেক ঐতিহাসিক যথেষ্ট বিচার বিবেচনা না করেই এ গ্রন্থটি মহারাজ প্রতাপরুদ্র-দেবের নিজরচনা বলে ভুল করেন) আমরা প্রতাপরুদ্রদেবের শ্রীপদ্মা, শ্রীপদ্মালয়া, শ্রীইলা ও শ্রীমহিলা নামে চারজন রাণীর উল্লেখ দেখতে পাই। এঁদেরই মধ্যে রাণী পদ্মাবতী হঠাৎ বীরসিংহ নামক এক বৌদ্ধের বিশেষ অনুগামী হয়ে ওঠেন। এই কারণে যখন রাজ্যের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ ভীষণভাবে রুষ্ট ও বিচলিত হয়ে উঠলেন তখন প্রতাপরুদ্র নিরুপায় হয়ে বসালেন এক বিচার সভা, যে সভা বিচার করবে কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ—বৌদ্ধ না সনাতন ধর্ম। ইতিহাস বলছে এই সভায় ব্রাহ্মণদের জয় হয়েছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি পাত্রতে ঢেকে রাখা এক সাপকে অদৃশ্য করে দিয়ে চাতুরীর মহিমায় ঐ তর্কযুদ্ধে সমাগত যুক্তিবাদী বৌদ্ধদের বোকা বানিয়ে পরাভূত করেছিল। এবং তারপরেই The king ordered the general massacre

of the Buddhists. Virasimha escaped to Dandakaranya, and the rest fled to the hilly tracts of Banki (The history of Medieval Vaishnabism in Orissa by P. Mukherji) কিন্তু এর ফলে বৌদ্ধদের অন্তরে ঐ চৈতন্য বিরোধীচক্রই এমন এক ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হ'ল যাতে বৌদ্ধরা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করে নিল যে চৈতন্য-ভক্ত উৎকলাধিপতি 'প্রতাপরুদ্রসংত্রাতা' বলে পরিচিত ব্রাহ্মণ চৈতন্য দেবেরই কূট মন্ত্রণায় ঐ বিচার সভা ডেকে প্রথমে ছলনাদ্বারা তাদের পরাভূত এবং পরে নিধন করতে প্ররোচিত হয়েছিলেন। সুতরাং এইবার উৎকলের বৌদ্ধসম্প্রদায়ও চৈতন্য বিরোধীচক্রের অন্যতম সমর্থক হয়ে উঠল অনতিবিলম্বে। এই পর্যন্ত বলে প্রভুজী হঠাৎ তাঁর ডানদিকটা চেপে ধরে যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে বলে উঠলেন—Oh that pain, that terrific pain !

পলকে দৌড়ে এসে ব্যাকুলভাবে জড়িয়ে ধরল বৈষ্ণবী প্রভুজীকে। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলল সেই ব্যথা আবার উঠল বাপি! আজ একই দিনে হু'বার! বলতে বলতে গলাটা বারবার কেঁপে উঠল যেন মেয়েটার। তাড়াতাড়ি প্রভুজীর আলখাল্লার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট শিশি বের করে এনে তার মধ্য থেকে ছুটা ট্যাবলেট ফেলে দিল বৃদ্ধের মুখে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন প্রভুজী মনে হ'ল। মেয়েটি রোদনরুদ্ধ সুরে অনেকটা ধমকের ভঙ্গীতেই বলতে লাগল You must take rest বাপি, rest you must.

আনন্দের কিন্তু চমকের পর চমকই লাগল এই ছোট্ট ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে। প্রথম চমক—মেয়েটির 'বাপি' সম্বোধন প্রভুজীকে! দ্বিতীয় চমক বিশুদ্ধ উচ্চারণে বৈষ্ণবীর ইংরাজী বলা। বৈষ্ণবীও কি তবে উচ্চশিক্ষিতা? কিন্তু ওর অমন চূড়া করে বাঁধা চুল, আর নাকের ওপর রসকলি আঁকা কেন তবে?

কেনই বা এতক্ষণ যাকে প্রভুজী বলে ডেকেছে, বিপৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাকেই সে বাপি বলে সম্বোধন করে বসল ?

ক্ষীণ কণ্ঠে প্রভুজী বললেন—তোমাদের দুজনকেই ব্যতিব্যস্ত করে তোলার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু এখন আরও কিছুদিন আমায় কাজ করতে যে দিতেই হবে মা মণি। দীর্ঘ ছ' বছর আমি উন্মাদের মত ঘুরে বেড়িয়েছি রাজমহেন্দ্রী, কপিলাস, কটক, কোন্টিলো, প্রতাপপুর, গোদাবরী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, সিলেট, রেমুনা, আলালনাথ। এখন আমার একটি স্থির সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই তৈরী হয়ে গেছে মহাপ্রভুর তিরোধানের ব্যাপারে। সে সিদ্ধান্ত অকাট্য তথ্য প্রমাণ আর যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাকী আছে আর মাত্র তিনটি প্রমাণ হাতে পাওয়ার। একটি তো আগামীকালই আমার হাতে পৌঁছে যাবে বলে আশা করছি। তারপর বাকী থাকবে আরও যে দু'টি, সে দু'টি পেতে খুব দেরী হবে বলে মনে হয় না। তাই তোমার এই অবাধ্য সন্তানটিকে আরও কিছুদিনের জন্য কাজ করতে দাও মা। এখনই rest নিতে বল না আমায়, for heaven's sake।

সমুদ্রের হাওয়া আসছে হু হু করে দক্ষিণ দিক থেকে। তারই দাপটে উড়ছে মেয়েটির বস্ত্রাঞ্চল। বিরাট পলাং গাছটির পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ছড়িয়ে পড়েছে বৃদ্ধ এবং তরুণীর চোখে মুখে। আনন্দ নির্বাক হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেই দৃশ্যের দিকে। তারপর আগ্রহ আকুল স্বরে শুধাল—চৈতন্য দেবের মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আপনি এরই মধ্যে উপস্থিত হতে পেরেছেন তাহলে ?

পেরেছি বৈকি! বৃদ্ধর চোখদুটি সহসা সাফল্যের সম্ভাবনার আনন্দে চক্ চক্ করে উঠল যেন। 'আমি এখন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি তোমাকে সেই জায়গাটা যেখানে আজ থেকে চারশ চুয়াল্লিশ বছর আগে আষাঢ় মাসের এক পূর্ণিমা তিথিতে

গোপনে পুঁতে ফেলা হয়েছিল নদীয়ার প্রেমের ঠাকুর নিমাই-এর ভাগবত তনুকে। Yes; I can spot out that particular place at this moment।

বিস্ময় বিহ্বল কণ্ঠে সহসা প্রায় চিৎকার করে উঠল আনন্দ, 'পারেন? পারেন সেই জায়গাটি আমায় একবার দেখিয়ে দিতে?'

'পারি, পারি Young man. But have patience please। বলেছি তো ইতিহাস কোন সিদ্ধান্ত পৌঁছতে পারে কেবলমাত্র তথ্য ও প্রমাণের পথ ধরে। আমার যে এখনও তিনটি প্রমাণ হাতে এসে পৌঁছতে বাকী আছে ভাই। So I can't open my lips now, rather I shouldn't।

কিন্তু আপনি যে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, প্রভুজী। আনন্দ বলল।

ও কিছু নয়, don't be worried unnecessarily. বুকের ভেতরটা হঠাৎ ক্র্যাম্প করে মাঝে মাঝে। এ ব্যাধি ত' আমার আজকের নয়।

তবু, আপনার বোধহয় আজ আর কথা বলা ঠিক হবে না। আপনি অসুস্থ, আপনি ক্লান্ত। তাছাড়া উনি বলছিলেন একটু আগে আজ একদিনেই নাকি তু'বার আপনার এমন ব্যথা··· ।

আনন্দের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, বৃদ্ধ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, উনি উনি করছ তুমি কাকে? আমার এই মা'টিকে? আরে না, না—ও যে এই সেদিন সবে তেইশে পড়েছে। ওকে আবার উনি উনি কেন? ওর নাম মাধবী, কেমিষ্ট্রী নিয়ে এম. এস-সি, পাশ করেছে গতবছর। কিন্তু স্বভাবে ও চৈতন্যদেবের সময়কার দেউলকরণ শিখি মাইতির বোন সেই মাধবীর মতই। যার সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

মাইতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী ॥

আপনার মেয়ে বুঝি ?

'আমি ওর জনক নই, কিন্তু ও আমার মেয়ে।' বৃদ্ধ স্নেহসিক্ত দৃষ্টি একবার মাধবীর ওপর বুলিয়ে নিয়ে পুনশ্চ বললেন—আমার পরলোক গত ছোট ভাই-এর একমাত্র সন্তান। কি দুর্ভাগিনী আমার এই মা-টি। মাত্র ছ' বছর যখন বয়স মাতৃহীনা হল, আট বছরে পিতৃহারা। উনিশ বছর যখন পূর্ণ হল, ওর বাল্যসহচর অসম্ভব মেধাবী এক ষ্টেট স্কলারশিপ পাওয়া ছেলের সঙ্গে বিয়ের সব পাকা হয়ে গেল। মাধবী তখন যুগল জীবনের স্বপ্নে ভরপুর। ঠিক এই সময়ে একটা এক্সিডেণ্টে চিরদিনের মত চোখ বুঁজল সেই তাজা তেজী পঁচিশ বছরের ছেলেটা। ব্যস, সেই থেকেই ও বেঁকে বসেছে। এ জীবনে বিয়ে আর নাকি করবে না।

আ-বাপি! মাধবী প্রতিবাদের সুরে বলল, ঐসব বাজে কথা শোনাবার জন্যে কি ওকে এই মাঝরাতে এমন জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছ ?'

ভদ্রলোক এইবার হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন আবার। স্নেহ আর মমতার অথৈ পাথার থেকে উঠে এসে তিনি বললেন—তাইত গোবর্ধনবাবু, আমি তো বুকে এক ধাকা খেয়েই একেবারে ভুল পথে চলে এসেছি। কতটা সময় তোমার নষ্ট করলাম বল ত'? I'm sorry, sincerely sorry. হ্যাঁ চৈতন্যবিরোধী চক্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কোথায় যেন পথ হারিয়েছিলাম মনে আছে ?

শেষ পর্যন্ত প্ররোচনায় পড়ে বৌদ্ধরাও ক্ষেপে উঠেছিল মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে। আপনি ঐ খানেই থেমেছিলেন মনে পড়ছে। আনন্দ ছিন্ন সূত্রটা পুনঃ সংযোজনে সচেষ্ট হল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক ধরিয়ে দিয়েছ, many thnaks, এইবার ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎকলরাজ্যের রঙ্গমঞ্চে সবচেয়ে বড় শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল যে কূটবুদ্ধিসম্পন্ন পশুপ্রবৃত্তির মানুষটি, তারই কথা শোনাব তোমাকে। তার নাম ছিল গোবিন্দ বিদ্যাধর।

গোবিন্দ বিদ্যাধর? যে প্রতাপরুদ্রের পর—'

উত্তেজিত প্রভুজী আনন্দকে তার বাক্য সমাপ্ত করতে না দিয়েই উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই গোবিন্দ বিদ্যাধর --যে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ থেকেই চেষ্টা করে চলেছিল ক্রমাগত উৎকলের সিংহাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সেই ভয়ানক রকমের উচ্চাভিলাষী ক্রুর স্বভাবের লোকটাই ছিল চৈতন্য বিরোধীচক্রের স্রষ্টা এবং নায়ক।

কিন্তু কেন প্রভুজী? রাজ্য নেবার যার লোভ তার লড়াই হবে ত' রাজার সংগে। সে চৈতন্যের সঙ্গে শত্রুতা করতে যাবে কেন? বৃদ্ধের বুকে আস্তে আস্তে হাত বুলাতে বুলাতে প্রশ্ন করল মাধবী।

কারণ অতি পরিষ্কার। প্রতাপরুদ্র নামে রাজা ছিলেন মাত্র। রাজকার্যের যে কোন অসুবিধার মুহূর্তেই রাজা পরামর্শ গ্রহণ করতেন তাঁর ভাবগুরু চৈতন্যদেবের কাছ থেকে। প্রতাপরুদ্রদেব বলতেন—

প্রভু কৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায়॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি!
রাজ্য ছাড়ি যোগী হই' হইব ভিখারী॥
(চৈঃ চ; ম. ১২।৯-১০)

এর থেকেই বুঝে নিতে কষ্ট হয় না—গম্ভীরার মেঝেতে গড়াগড়ি খাওয়া গৈরিকবসন পরিহিত সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গই ছিলেন তখন আসল

উৎকলাধিপতি। এবং এরই সঙ্গে গোবিন্দ বিদ্যাধর সভয়ে আরও লক্ষ্য করছিল যে দিনে দিনে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জন্য সারা দেশের লোক কেমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল ভক্তিতে এবং শ্রদ্ধায়। এত বড় জনপ্রিয় লোকনেতা, ধর্মনেতা, সমাজনেতা বেঁচে থাকতে তার পক্ষে প্রতাপরুদ্রকে সিংহাসনচ্যুত করা এক প্রকার অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল বোধ হয় গোবিন্দ বিদ্যাধরের। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গদেশের সুলতান কর্তৃক উড়িষ্যা আক্রান্ত হয় সেই সময়ই সর্বপ্রথম গোবিন্দ বিদ্যাধর বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি। অর্থাৎ ১৫০৯ থেকে আরম্ভ হয়েছিল গোবিন্দ বিদ্যাধর কর্তৃক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার। উদার মন প্রতাপরুদ্র তা বুঝতে পারেন নি। তাই রণাঙ্গনে অতবড় বিশ্বাসঘাতী কাজ করার পরেও তিনি গোবিন্দকে কেবল ক্ষমার চোখেই দেখেন নি তিনি গোবিন্দকে রাজকার্যে উচ্চপদে বহালও রেখেছিলেন অনুকম্পাবশেই। আর সেই অনুকম্পারই প্রতিদান দিয়েছিল গোবিন্দ বিদ্যাধর প্রতাপরুদ্র-সমর্থক অনন্যব্যক্তিত্ব মহাপ্রভুকে চিরদিনের মত ভক্তচক্ষু থেকে অপসারিত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র করে, প্রতাপরুদ্রের সিংহাসনে স্বয়ং আসীন হবার ঘৃণ্য অভিসন্ধি এঁটে আর প্রতাপরুদ্রের পুত্র কালুআ দেব (Kalua Dev) ও কখারুয়া (Kakharua) দেবকে (মাদলা পঞ্জী, প্রাচী সংস্করণ, পৃঃ ৫৬) হত্যা করে।

'হত্যা? রাজপুত্র দু'জনকে হত্যা করেছিল গোবিন্দ বিদ্যাধর?' মাধবী যেন শিউরে উঠল হত্যার কথা শুনে।

Yes মা মণি, দুই নাবালক রাজপুত্র একের পর এক খুন হয়েছিল ঐ শয়তান গোবিন্দ বিদ্যাধরের হাতে।

আনন্দ শুধাল—তা এই যে এতবড় একটা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারিত হয়েছিল বলছেন রাজা আর চৈতন্যের বিরুদ্ধে সে কথা প্রতাপরুদ্র বা মহাপ্রভুর কেউই কি বুঝতে পারেন নি।

পেরেছিলেন নিশ্চয়ই। নইলে চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের কিছুকাল পূর্বে জগদানন্দ পণ্ডিতের হাত দিয়ে অদ্বৈতাচার্য এমন একটি তর্জা লিখে পাঠাবেন কেন? তর্জাটি ছিল—

বাউলকে কহিহ—লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিহ—কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ—ইহা কহিয়াছে বাউল॥

শ্রীচৈতন্য যখন ভক্তবৃন্দের মধ্যে বসে নীলাচলে ইষ্ঠগোষ্ঠীতে মেতে ছিলেন, সেই সময়ে জগদানন্দ গিয়ে শান্তিপুর থেকে আনা অদ্বৈতাচার্যের তর্জাটি শোনালেন তাঁকে।

এ তর্জার মানে তো কিছুই বুঝতে পারলাম না প্রভুজী। মাধবী বল্‌ল।

তুমি কেন! এ তর্জার অর্থ চৈতন্যের অন্তরঙ্গ সহচর স্বরূপ দামোদরও বুঝে উঠতে পারে নি সেদিন। তাই সে মহাপ্রভুর কাছেই জান্‌তে চেয়েছিল অদ্বৈতাচার্যের তর্জার ব্যাখ্যা। স্বরূপ গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট করে জবাব দিয়েছিলেন মহাপ্রভু। তিনি ঈষৎ হাস্‌বার চেষ্টা করে বলেছিলেন, আগম আচার্য শাস্ত্রে পরম পারঙ্গম একথা তোমার অজানা নয় স্বরূপ। দেবতার আবাহন এবং বিসর্জন দুই অনুষ্ঠানই তাঁর উত্তমরূপে জানা আছে। মাত্র এইটুকু বলেই নীরব হয়েছিলেন মহাপ্রভু। কিন্তু তিনি যে আসল কথাটি গোপন করতে সচেষ্ট সেটা বুঝতে কষ্ট হল না নীলাচলে চৈতন্য লীলার সর্বশ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ স্বরূপ দামোদরের! অদ্বৈতের আবাহনেই একদিন ঘটেছিল মহাপ্রভুর মহা-আবির্ভাব ভাগীরথী তীরে—নবদ্বীপে। একথা কেই বা না জানে। আজ বোধ হয় আচার্য তাঁর দেবতা শ্রীচৈতন্যের বিসর্জনেরই ইঙ্গিত পাঠিয়েছেন ঐ তর্জার প্রহেলিকাময় শব্দগুলির মধ্যে দিয়ে স্বয়ং মহাপ্রভুরই কাছে।

'কিন্তু এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্রের আভাষ কি দেওয়া ছিল?'

ছিল বৈকি! ঐ যে দেখছ না—হাটে বিকায় না চাউল! এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বলেছেন—আর বেশি লোক তোমার ঐ গোপী প্রেমের তাৎপর্য গ্রহণ করতে রাজী হবে না (শ্রীচৈতন্যদেব পৃঃ ৪১১), অর্থাৎ তোমার 'গোপী-প্রেমের' বিরোধিতা এবার আসন্ন। বৃদ্ধ থাম্‌লেন একবার। নাসিকারন্ধ্র পুনর্বার কড়া নস্যে পূর্ণ করে তিনি কথা বল্‌লেন আবার। বল্‌লেন—অদ্বৈতাচার্যের এই সাবধানবাণী তর্জার ভেতর দিয়ে পাওয়ার পর শ্রীচৈতন্যের মানসিক ভারসাম্য যে কি সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ —

সেই দিন হইতে প্রভুর আর দশা হইল।
কৃষ্ণের বিরহদশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
রাধা ভাবাবেগে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥
...রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলাপন।
স্বরূপে পুছেন জানি নিজ-সমাপন ॥

(চঃ চৈঃ, অ, ১৯।৩০, ৩১, ৩৩)

ইতিহাস বল্‌ছে ঐ তর্জা প্রাপ্তির পরেই ভক্তগণ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিল মহাপ্রভু গম্ভীরার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন অতি অকস্মাৎ। সাধারণের মধ্যে বেরুনোও তিনি প্রায় বন্ধ করে দিলেন স্বেচ্ছায়! তর্জা শুনে প্রথমেই চৈতন্য কি বলেছিলেন মনে আছে?

তর্জা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
'তাঁর যেই আজ্ঞা' বলি মৌন ধরিলা ॥

(চৈঃ চঃ, অ, ১৯।২৫)

অর্থাৎ, তিনি বল্‌লেন, বেশ তাই হবে। তাঁর (অদ্বৈতাচার্যের) আজ্ঞাই প্রতিপালিত হবে। তাহলে বুঝতেই পারছ ঐ তর্জার মাধ্যমে অদ্বৈতাচার্য কেবল আসন্ন বিপদের ইঙ্গিতই দেন নি চৈতন্যকে, প্রচ্ছন্নভাবে

আজ্ঞাও দিয়েছিলেন গোপীপ্রেম প্রচার অর্থাৎ ভক্তি আন্দোলন থেকে নিজেকে অবিলম্বে সরিয়ে নেবার। এবং বলাই বাহুল্য, এই ঘটনার অনতিকাল পরই হঠাৎ একদিন ঘটে গেল মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক সেই অন্তর্দ্ধান।

আশ্চর্য আপনার ঘটনা বিশ্লেষণ করার শক্তি। মুগ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করল আনন্দ। নীরব অতীতকে সরব করে তুল্‌তে চাইলে সর্বাগ্রে চাই কিম্বদন্তী, জনশ্রুতি আর ইতিবৃত্তের ত্রিবেণী সঙ্গমে দাঁড়িয়ে কথিত ঘটনারাজির নির্দয় ডিসেক্‌শন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ। তবেই সেই সঙ্গম-স্নানের পুণ্যফল স্বরূপ সত্য একদিন স্বয়ং এসে ধরা দেবে তোমার হাতে। কিন্তু সেকথা এখন থাক। এইবার তাকিয়ে দেখ মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব গজপতির দিকে। তিনিও যে গোবিন্দ বিদ্যাধর এবং তার সৃষ্ট ঐ দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন এবং সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাক্‌তেন। তার প্রধান প্রমাণ, চৈতন্যদেব অন্তর্হিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ত্রাসে পুরী ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হ'ন তিনি বিড়ানেসীতে অর্থাৎ কটকে।

(রাজা শ্রাবণ পাঞ্চ দিনে বিড়ানেসী গমিলে।
নিহাঁশ হোই গহন মান পেশিলে॥
বৈষ্ণবচরণ দাসের চৈতন্যচকড়া)

এত ভক্তি করতেন যাঁকে রাজা, যাঁর জন্য নিজরাজ্য পর্যন্ত উৎসর্গ করতে সদাপ্রস্তুত ছিলেন তিনি—সেই চৈতন্যের অন্তর্দ্ধান সংবাদ শোনার পরেই রথযাত্রার বিরাট উৎসবের মধ্যেই তাঁর এই পুরী ত্যাগ থেকেই বুঝতে পারা যায় চৈতন্যের ঐশ্বরিক শক্তি এবং সর্বজয়ী ব্যক্তিত্বের ওপর কতখানি নির্ভরশীল ছিলেন রাজা। এবং তাই যখন মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধরের সমস্ত হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়বার একমাত্র ভরসাস্থল তৎকালীন কলিঙ্গ-বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম জনপ্রিয় ধর্মনেতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেও হঠাৎ কোথাও আর খুঁজে পাওয়া গেল না নীলাচলে, তখন নিজের নিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় পুরী ত্যাগ না করে

আর উপায় ছিল না প্রতাপরুদ্রের। কারণ রাজা তাঁর রাজ্যের অবস্থা তখন যে ভালভাবেই জানতেন। এই সময়কার রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রভাত মুখার্জি মশায় লিখেছেন – Assassination, rebellion and struggle for power brought about internal anarchy (The History of Medieval Vaishnavism in Orissa by Prabhat Mukharji. Chap XI, P. 177)।

কী বীভৎস নারকীয় পরিবেশ তখন সারা উৎকল রাজ্যজুড়ে।

কিন্তু চৈতন্যমহাপ্রভু এবং রাজাকে সরাবার ষড়যন্ত্র যে ঐ গোবিন্দ বিদ্যাধর এবং তাঁর সৃষ্ট শয়তানের চক্রই করেছিলেন, এর প্রমাণ তো ইতিহাসে পাওয়া যায় নি! আনন্দের সংশয়।

কে বলেছে পাওয়া যায় না। রাম যদি আজ খুন হন এবং কালই যদি দেখা যায় সেই রামের সম্পত্তি দখল করে নিল শ্যাম, তবে পুলিশ কি করবে? পুলিশ ঐ শ্যামকে গ্রেপ্তার করবে রামকে খুন করার দায়ে। কেন? এইখানেই আসছে 'মোডাস্ অপারেণ্ডির' কথা। নিশ্চয়ই শ্যামের লোভ ছিল রামের সম্পত্তির ওপরে। তাই রামকে খুন করেই সে রামের সম্পত্তি দখল করেছে। প্রতাপরুদ্রের ক্ষেত্রেও ঘটেছে ঠিক সেই রকমই। যতদিন চৈতন্যকে ভক্তচক্ষু থেকে সরান যায় নি, ততদিন কূটচক্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর চুপ করেই ছিল। কারণ সে জানত শ্রীচৈতন্যের মত দুর্জয় ব্যক্তিত্ব পুরীতে থাকতে প্রতাপরুদ্রকে সিংহাসনচ্যুত করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে কিছুতেই। কিন্তু চৈতন্যের অদৃশ্য হওয়ার পরেই প্রকাশ পেল তার আসল রূপ। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক এবং লজ্জাকর ঐ মহাপ্রভুর নিশ্চিহ্ন হওয়ার ঘটনাটি ঘটে গেল। আর পুরীমন্দিরে রক্ষিত প্রাচীন মাদলা পঞ্জী (মাদলা পঞ্জী, প্রাচীসংস্করণ ১৯৪০, পৃঃ ৫৮) বলেছে। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে সেই গোবিন্দ বিদ্যাধরকে

দেখা গেল উড়িষ্যার সিংহাসনে ভোই রাজবংশের (Bhoi Dynasty) প্রতিষ্ঠাতারূপে জাঁকিয়ে বসতে। এর থেকেই 'মোডাস অপারেণ্ডি' খুঁজে নেওয়া কি খুব কঠিন? কেবল তাই নয়, নিজের 'মোডাস্ অপারেণ্ডি' ঢাকতেই শয়তান বিদ্যাধর প্রতাপরুদ্রের দুই নাবালক পুত্রকে পর পর লোক দেখান সিংহাসনে বসিয়ে নিজেই আবার তাদের হত্যা করিয়ে অবশেষে স্বয়ং আরোহণ করল সিংহাসনে। তখনও জীবিত, (মাদলা পঞ্জী বলছে—প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের তিরোভাবের তিন বছর আগেই মারা যান। কিন্তু একথা কখনই ঠিক নয়। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কবি কর্ণপুর রচিত 'চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকম্'-এর প্রস্তাবনায় এবং শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর রচিত 'শ্রীশ্রীভক্তি রত্নাকরের' তৃতীয় তরঙ্গে চৈতন্যবিচ্ছেদে কাতর রাজা প্রতাপরুদ্রের মানসিক দুর্দশার সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। লোচন দাসও 'চৈতন্য মঙ্গলে' লিখেছেন—

শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে।
পরিবারসহ রাজা হরিল চেতনে॥

বৈষ্ণব দাসও তাঁর চৈতন্য চকৃড়ায় সমর্থন করেছেন এ কথার।) শঙ্কা ও শোকে স্তব্ধ প্রতাপরুদ্র। আমার মনে হয় যে কারণে প্রতাপরুদ্র নিজের চোখে চৈতন্যমহাপ্রভু ও দুই রাজপুত্রের চিরবিদায়গ্রহণ প্রত্যক্ষ করেও প্রতিবাদের একটি কথাও উচ্চারণ করতে সাহসী হন নি। যে কারণে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর পঞ্চাশটি বছর উৎকল এবং বঙ্গের বৈষ্ণবমণ্ডলী নিদারুণ আতঙ্কে স্তব্ধ করে রেখেছিল নিজেদের পরমপ্রিয় নামসংকীর্ত্তনকে, ঠিক সেই কারণেই চৈতন্যদেবের ওপর লেখা প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থই ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছে চৈতন্য তিরোধানের শেষমুহূর্তের দৃশ্য বর্ণনাকে। আর সেই জন্যেই দেখতে পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ এদের কারুর বর্ণনার সঙ্গে কারুর বর্ণনার কোথাও

মিল নেই। অথচ একই মহাপ্রভুর সম্বন্ধে লিখেছেন কিন্তু তাঁরা সবাই এবং লেখকদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন মহাপ্রভুর সমসাময়িক।

আনন্দ বল্‌ল—সত্যি এটা আমারও ভারী অদ্ভুত ঠেকে। বৈষ্ণবরা বলেন শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান ছিলেন, অতএব তাঁর আবার মৃত্যু কি? কিন্তু যে কৃষ্ণ সম্বন্ধে বৈষ্ণব গ্রন্থেই বলা হয়েছে—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥
(চৈঃ চঃ আ ৫।১৪২)

সেই শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পূর্ণ বিবরণ পাচ্ছি কিন্তু আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্দের ত্রিশ অধ্যায়ে। অথচ শ্রীচৈতন্যের দেহাবসানের কথা বৃন্দাবন দাস তো উচ্চারণই করলেন না, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সূত্রের ইঙ্গিত মাত্র দিয়ে থেমে গেলেন। দিবাকর দাস, অচ্যুতানন্দ দাস, লোচন দাস গাইলেন জগন্নাথে লীন হয়ে যাবার গান। আর জয়ানন্দ বললেন একেবারে অন্য কাহিনী। চৈতন্যের পায়ের ক্ষত বিষাক্ত হওয়ার ফলেই নাকি তাঁর জীবনাবসান।

প্রভুজী বলে উঠলেন—থাকবেই তো পার্থক্য! চৈতন্যের তিরোধানের পর গোবিন্দ বিদ্যাধর চক্রের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে আসল ঘটনা চাপা দিয়ে চৈতন্যের উধাও হওয়ার ঘটনাটা যার যেমন কল্পনায় এসেছে সে তেমন ভাবেই লিখেছে যে; শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তেমন ভয় ত' তখন কারও প্রাণে ছিল না।

আনন্দ এবার আসল প্রশ্নটি পেশ করে বসল—প্রজ্ঞাবান শক্তিমান তীক্ষ্ণধী সেই অজ্ঞাতনামা ঐতিহাসিকের সামনে। যে প্রশ্নের প্রহেলিকাতে আচ্ছন্ন হয়ে সে এবার পুরীতে ছুটে এসেছে।

সে জিজ্ঞাসা করল এইবার বলুন—মহাপ্রভুর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল কেমনভাবে কোথায় গেল তাঁর দেহ ?

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন আনন্দের এই সোজা দুটি প্রশ্ন শুনে। পুঁটিয়াষ্টেটের কোন ভদ্রলোকের দাক্ষিণ্যে নির্মিত দু'কোঠা-ওয়ালা ভজন কুটির সান বাঁধান ছোট চত্বর থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে পথ চলতে লাগলেন তিনি মাধবীর কাঁধে হাত রেখে। আনন্দ তাঁর অপর পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াতেই আর একখানি হাত তিনি তুলে দিলেন যুবক-স্কন্ধে বিনা দ্বিধায়! চলতে চলতে বললেন, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের হাতের কলমের দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সেই কলমের সম্মান রক্ষা করতে তাই ডুবেছিলাম নিরলস গবেষণায়। আজ সেই কলম তোমাকে দিয়েছি গোবর্দ্ধনবাবু। আমার দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ঝুলি তোমাকে ছাড়া আর কার কাছে ঢেলে দেব। সব জানতে পারবে, সব বল্‌ব তোমায়। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে যে। চারশ চুয়াল্লিশ বছর আগেকার একটা বিরাট এবং বিশ্রী ষড়যন্ত্রের শেষটুকু ত' এমন ভিনি-ভিদি-ভিসি করে জানা যাবে না। বলেছি ত', আমি এই মুহূর্ত্তেই ছুটে গিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি কোথায়, ঠিক কোন জায়গার মাটির নীচে শুইয়ে রাখা হয়েছে বঙ্গ-কলিঙ্গের ভাবধারার মিলন সেতু নদীয়ার গৌর সুন্দরকে। যাঁকে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী আখ্যা দিয়েছিলেন নীলাচল বিভূষণ বলে। যাকে সচল জগন্নাথ আখ্যা দিয়ে বৃন্দাবন দাস লিখেছিলেন—

মহানন্দে সর্বলোক জয় জয় বলে।
আইলা সচল জগন্নাথ নীলাচলে ॥

কিন্তু তা করবার আগে আরও তিনটি তথ্যের আমার প্রয়োজন। তারমধ্যে একটা মনে হয় কালই হাতে এসে যাবে।

কালই? সে তথ্যটি কি? কোথায় পাবেন সেটি।

নস্কর ভিলার গা ঘেষে বালির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন প্রভুজী নীরবে। কিছুক্ষণ পরে এক সময়ে আবার মুখ খুললেন তিনি, আমি জানি চৈতন্যদেব জগন্নাথে লীন হন নি! তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরামের মতই দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই দেহটা গেল কোথায়? আমি সেটাও বলে দিতে পারি একটু আগেই তা তোমাকে বলেছি। গবেষণার পথে চলতে চলতে একটা ধারণা আমার মনের মধ্যে জন্মে গিয়েছিল। যারা শত্রুতা করে চৈতন্যদেবের অকাল মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল, নিশ্চয়ই তারা জবরদস্তি করে শোকাহত আতঙ্ক বিহ্বল প্রতাপরুদ্রের কাছ থেকে চৈতন্যদেবের দেহকে সমাধিস্থ করার কোন না কোন রকমের আদেশ একটা আদায় করে নিয়েছিল নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে। আগামীকাল যে তালপাতার প্রাচীন পুঁথিটি আমার হাতে আসার সম্ভাবনা তাতে আশা করছি মহারাজের ঐ আদেশ দানের কোন নিশ্চিত প্রমাণ আমি হয় ত' পাব।

তালপাতার পুঁথি? কোন গ্রন্থ নাকি? কার লেখা? আনন্দ উত্তেজনায় উত্তাল।

হ্যাঁ, পুঁথি মানেই ত' গ্রন্থ। এ গ্রন্থের নাম চৈতন্য চকড়া। প্রাচীন ওড়িয়া লিপি এবং ভাষাতে লেখা। লিখেছিলেন শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাস, উনি ছিলেন চৈতন্যের সমসাময়িক।

কোথেকে পেলেন?

গঞ্জাম জেলার শিকুলা গ্রামের শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাণ্ডার গৃহ থেকে। অবশ্য এ বিষয়ে আমার প্রধান সহায়ক বর্ত্তমান উৎকলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক পদ্মশ্রী উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত শ্রীসদাশিব রথশর্মা। আগামীকাল তিনিই আমাকে পড়ে শোনাবেন সেই চৈতন্য চকড়ার পুঁথি। তুমিও এস না সেই সময়ে! সেই পুঁথিপাঠের পর আবার কিছুটা আলোচনা করতে পারব আমরা তোমার একটু আগে

জিজ্ঞেসা করা ঐ প্রশ্ন দু'টি নিয়ে। কেমনভাবে ঘনিয়ে এসেছিল মহাপ্রভুর শেষ মুহূর্ত আর কোথায় গেল তাঁর দেহটি।

কোথায় যেতে হবে আমাকে? তাড়াতাড়ি জানতে চাইল আনন্দ।

তোমার বর্ত্তমান আবাস ঐ স্বর্গদ্বারেই আগামীকাল সন্ধ্যা ছ' টায় আসছেন রথশর্মাজী চৈতন্যচক্‌ড়া নিয়ে। মাধবী ঠিক সময় গিয়ে তোমায় ডেকে আনবে।

এরপর আর কোন কথা না বলে আনন্দ এবং মাধবীর কাঁধে দু' হাত রেখে অনেকক্ষণ সমুদ্রের একেবারে ধার ঘেষে পথ অতিক্রম করলেন প্রভুজী। যখন বাঁদিকে অদূরে মা আনন্দময়ী আশ্রম এবং স্বর্গদ্বার মহাশ্মশানের সমাধি মন্দিরগুলি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হল তখন হঠাৎ বৃদ্ধ থমকে দাঁড়ালেন একবার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। তারপর চন্দ্রালোকপ্লাবিত মধ্যনিশার গগন পবন আলোড়িত করে সহসা ভাবোচ্ছাসিত কণ্ঠে অপূর্ব সুর তুলে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ।
ক্কচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্‌॥

শেষের দিকে মাধবীও প্রভুজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সুর ধরেছিল। আনন্দ মুগ্ধ হয়ে শুনছিল অন্তর থেকে স্বতোৎসারিত এক বৃদ্ধ এবং আর এক তরুণীর অপূর্ব দ্বৈত-স্তোত্রগান। শেষে বৃদ্ধ কম্পিত স্বরে বললেন—এটি গেয়েছিলেন শ্রীরূপগোস্বামী চৈতন্য-দেবের অন্তর্দ্ধানের পর দুঃসহ বিরহে ব্যাকুল হয়ে। নিরুপায় নয়নাশ্রুতে গণ্ডপ্লাবিত করে তিনি বলেছিলেন এই গানের মধ্য দিয়ে। সমুদ্রতীরের উপবনরাজি দেখলেই বারবার যিনি বৃন্দাবনের

স্মৃতিতে প্রেমবিবশ হয়ে পড়তেন, কখনও যা অবিরাম শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে যাঁর রসনা চঞ্চল হয়ে উঠত সেই ভক্তিরসরসিক চৈতন্যদেবকে আবার কি কখনও আমরা দেখতে পাব ?

বল্‌তে বল্‌তে প্রভুজীর স্বর সহসা অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হয়ে এল প্রায়।

॥ পাঁচ ॥

পরদিবস মাধবী যখন আনন্দকে নিতে এল তখন পাঁচটা বেজে গেছে। বাসন্তী রং-এর শাড়ী পরে, চুড়ো করে চুল না বেঁধে, নাক-কপালকে তিলকহীন রেখেই মাধবী এসেছে দেখে আনন্দ জিজ্ঞেসা করল আজ যে বৈষ্ণবী সাজ নি বড় ?

চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক তুলে জবাব দিল মাধবী—তুমি গোঁসাই হতে রাজী হলে না বলে !

তার মানে ? আনন্দ অবাক্ হল মেয়েটির আজকের এই তামাসার ঢং এ কথা বলা দেখে।

মানে আর কি ! গত রাতে যখন তোমায় গোবর্দ্ধন গোঁসাই বলে ডাক্লাম সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে, তখন তুমি তেতে উঠে বললে না আমি গোবর্দ্ধনও নই, গোঁসাইও নই ! বলেই সে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। হাসির দাপট থামলে পুনশ্চ বল্ল—আসলে কি জান ? প্রভুজীর আদেশ সভায় বা আসরে যখন যাবে তখন বৈষ্ণবীর সাজ নয়।

কিন্তু অন্য সময়েই বা তোমাকে বৈষ্ণবী সাজতে হয় কেন ? একি কোন ছদ্মবেশ ?

ছদ্মবেশ নয় গো, ছদ্মবেশ নয়। ঐটিই এখন আমার আসল বেশ। প্রভুজীর সঙ্গে আমিও যে দু বছর হল চৈতন্যব্রত গ্রহণ করেছি।

চৈতন্যব্রত ?

হ্যাঁ গো, চৈতন্যব্রত। প্রভুজী কি বলেন জান ? বলেন

আধ্যাত্মিক চৈতন্যের পূর্ণবিকাশ ছিলেন পুরুষোত্তম বিশ্বম্ভর যাঁর সন্ন্যাস নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁর পুণ্য জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সত্যাসত্য খুঁজে বের করতে গেলে চৈতন্যব্রত যে নিতেই হবে। জান আজ দু' বছর হয়ে গেল বাপি মাছ-মাংস ডিম পেঁয়াজ স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না। দু' সন্ধ্যা মাত্র আহার করেন। হয় সাদা না হয় গেরুয়া কাপড় জামা পরেন। চব্বিশ ঘণ্টায় তিন ঘণ্টার বেশি কখনও ঘুমান না। কী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন যে করে চলেছেন তিনি।

আর তুমি? তুমিও ত' বললে ঐ একই ব্রতের ব্রতিনী।

আমি মেয়েমানুষ আমার কথা ছেড়ে দাও। ব্রত উপোস এগুলি ত' মেয়েদেরই কাজ কিন্তু প্রভুজী আমাকে বাপি বলে ডাকতে পর্য্যন্ত দেন না আর। ডাকতে হয় প্রভুজী বলে!

পাশাপাশি চলেছে দুই যুবক-যুবতী যারা কেউ কারও পরিচয় এখনও একরকম জানেনা বললে হয়। তবু আশ্চর্য্য! চৈতন্যানু-সন্ধানের কাজে উভয়েই ব্রতী বলে বোধ হয় দুজনের অন্তরের গভীরে কোথাও যেন একটা পরমাত্মীয়তাবোধ নিঃশব্দে দানা বেঁধে উঠতে চাইছে এরই মধ্যে।

মেয়েটি নীরবতা ভঙ্গ করে আবার কথা বলল –কী বিলাসীই না ছিলেন প্রভুজী এই ব্রত গ্রহণের আগে। আমার আমেরিকান জ্যেঠিমা যখন মারা যান প্রভুজীর বয়স তখন একচল্লিশও পার হয় নি। ষ্টেট্‌সেই অধ্যাপনা করেছেন বেশ কিছুদিন। আমারও লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয় ঐ দেশেই।

তুমিও আমেরিকায় ছিলে তাহলে? তাই কাল আশ্চর্য হয়েছিলাম তোমার ইংরাজী উচ্চারণে বিদেশী অ্যাকসেন্ট লক্ষ্য করে।

বছরের পর বছর ওদেশের বিলাসবহুল জীবনের মধ্যে কাটিয়ে

এলেন যিনি তাঁর কি বার্দ্ধক্যে হঠাৎ এমন সব ছেড়ে দেওয়া সহ্য হয়? বুকের ব্যথা ত আরম্ভ হয়েছে ব্রত গ্রহণ করার পর থেকেই। চকিতে চেয়ে দেখল আনন্দ মাধবার সদা হাস্যময় মুখখানি অব্যক্ত বেদনার ভারে যেন ছল ছল করছে।

একতলা বাড়ীটির যে ঘরে প্রভুজী বসেছিলেন চৈতন্য চকড়া পাঠরত পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা এবং পোষ্টমাষ্টার সদানন্দ মিশ্রের সঙ্গে, ছোট একটি জবাফুলের বাগান পার হয়ে সেই ঘরে গিয়ে নিঃশব্দ পদ বিক্ষেপে প্রবেশ করল আনন্দ। তরুণী কিন্তু বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। গায়ের রং ফর্সা না হলেও চোখে মুখে পাণ্ডিত্যের আভিজাত্য বেশ স্পষ্ট রথশর্মাজীর। খালি গা, খালি পা, চোখে চশমা। দেহের ওড়নাটি দুমড়ে কুঁচকে তালগোল পাকান অবস্থায় পড়ে আছে উরু অবধি তুলে বসা কাপড়ের ওপরে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত নেই পুরীর সর্বজন শ্রদ্ধেয় ঐ জ্ঞান-তপস্বীর। তিনি তালপত্রের পুঁথিটির নির্বাণ অধ্যায় থেকে পাঠ করে চলেছেন ছত্রের পর ছত্র, আর সদানন্দ মিশ্র সেগুলি তুলে নিচ্ছেন একটি কাগজের ওপরে একাগ্র মনে কলম চালিয়ে।

আধঘণ্টার মধ্যেই পুঁথি-পড়া শেষ করে কর্মব্যস্ত রথশর্মাজীর সঙ্গে সদানন্দবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই প্রভুজী চাপা কণ্ঠে বলে উঠলেন আরে! এসে গেছ? আমার আশা ব্যর্থ হয়নি গোবর্দ্ধনবাবু। পাওয়া গেছে প্রতাপরুদ্রের সেই সমাধি দেওয়ার আদেশের কথা এই চৈতন্যচকড়ায়, আমার ছ'বছরের সাধনার উপসংহারের মুহূর্ত্তে এ যে কত বড় একটা পাওয়া।

কই দেখি কোথায় সেই আদেশ। উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে আনন্দও। Here, here it is এই ছাখ; স্পষ্ট লিখেছেন বৈষ্ণব দাস –

বুড়া লেংকা যাই বালি নবরে প্রবেশিল।
রাজা-আজ্ঞা ছামুয়ে একথা নিবেদিল॥

আজ্ঞা দিলে বিলোপিনো রাজা শ্রীঅঙ্গকু।
সমাধি করলি সর্বে নাম রতন ঘোষি॥

অর্থাৎ বুড়া লেংকা চৈতন্যের মৃত্যুর খবর বালিসাই এর রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজার কাছে নিবেদন করল। শোকে বিলাপ করতে করতে রাজা তখন আদেশ দিলেন শ্রীচৈতন্যের শ্রীঅঙ্গকে শ্রীহরির নাম করতে করতে যেন সমাধিস্থ করা হয়। Oh what a great job this kind hearted Rathasarmaji has done for me, for all future students of history! এই বলে চৈতন্য চক্ড়ার পুঁথিটি সযত্নে নিজের সাইড ব্যাগের মধ্যে ভরে ফেলে আবার কথা বল্‌লেন বৃদ্ধ—আর দুটি মাত্র প্রমাণ বাকী রয়ে গেল গোবর্দ্ধন। তার একটির জন্যে আজই রাতে রওনা হব আমি রাজমহেন্দ্রীতে।'

এই সময়ে তড়িৎ পদে ঘরে ঢুকে মাধবী নিজের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করল—আজই? আজই তুমি রাজমহেন্দ্রী যাত্রা করবে বাপি? কিন্তু তোমার বুকের ব্যথাটা যে—

আরে ঐ ব্যথাই ত' এখন আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মা-মণি। ওর জন্যে তুমি কোন চিন্তা কোর না। এই বলে প্রাণখোলা কিছুটা হাসি হেসে নিয়ে প্রভুজী বললেন—No further light talks please. এইবার গোবর্দ্ধনবাবু ভালভাবে চোখ লাগাও সেই তিনটি প্রধান গ্রন্থের মধ্যে। যে তিনটিতে চৈতন্যের তিরোধান সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছুটাও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দ্যাখ তিনটির মধ্যে কোন কোন কথাগুলির মিল আছে একটার সঙ্গে আর একটার।

কিন্তু চৈতন্যচকড়া যিনি লিখেছেন সেই বৈষ্ণব দাস চৈতন্য-দেবের তিরোধানের বিবরণ দিয়েছেন কার কাছ থেকে শুনে? আনন্দের জিজ্ঞাসা।

কারুর মুখ থেকে ত' তিনি শোনেন নি। আজ পর্য্যন্ত যতগুলি বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়েছি তার মধ্যে কোনটিতেই কোন কবি এই বৈষ্ণবদাসের মতন এমন জোর গলায় বলেন নি—

এমন্ত প্রভু যে অন্তলীলা বাণী।
কহিলে বৈষ্ণব দাস প্রত্যক্ষ যাহা জানি॥

এই বৈষ্ণবদাসই একমাত্র নিজেকে প্রত্যক্ষদর্শী বলে ঘোষণা করেছেন। এখন আগে নজর দাও মিলগুলির দিকে। ছ্যাখ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল এবং বৈষ্ণব দাসের চৈতন্য চকড়া পড়লে কতকগুলি ব্যাপারে কিন্তু অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। কারণ কতকগুলি ক্ষেত্রে তিনটি গ্রন্থেই প্রায় একই কথা বলছে। জয়ানন্দ, লোচন দাস এবং বৈষ্ণব দাস তিনজনেই বলছেন চৈতন্যের তিরোধান ঘটেছিল আষাঢ় মাসে রথযাত্রা সময়ে, সুতরাং শুক্লপক্ষে। তিনজনেই বলছেন সেই সময়ে প্রতাপরুদ্রদেব পুরীতেই ছিলেন। তিথিটা লোচন দাস আর জয়ানন্দের মতে ছিল সপ্তমী এবং বৈষ্ণব দাসের মতে পূর্ণিমা। দেহাবসানের সময় পাওয়া যাচ্ছে দুটি। লোচন দাস লিখেছেন—

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

তৃতীয় প্রহর মানে—ধর বেলা তিনটে কি চারটের সময়। এদিকে জয়ানন্দ এবং বৈষ্ণব দাস দুজনাই বলছেন রাত্রি দশ দণ্ডের কথা। দশদণ্ড বলতে রাত্রি প্রায় এগারটা বুঝায়। জয়ানন্দের ভাষায় —

পণ্ডিত গোঁসাইকে কহিল সর্ব কথা!
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা॥

চৈতন্য চকড়ায় আছে—

রাত্র দশ দণ্ডে চন্দন বিজয় যখন হ'ল,
তখন পড়িলা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পছ আড়ে।
কান্দিল বৈষ্ণবগণ কুহাতো কুহাড়ে॥

অর্থাৎ মহাপ্রভুর দেহ গরুড় স্তম্ভের পেছনে পড়ে গেল, বৈষ্ণবগণ সবাই আকুলি-বিকুলি করে কেঁদে উঠল। সুতরাং এখন ধরে নেওয়া যেতে পারে শ্রীচৈতন্য বেলা চারটা থেকে রাত্রি এগারটার মধ্যে কোন এক সময়ে দেহত্যাগ করেছেন। কিন্তু কোথায়? লোচন দাস বলছেন গুণ্ডিচায় তিনি জগন্নাথের সঙ্গে মিশে গেলেন। বৈষ্ণব দাস জগন্নাথ মন্দিরে চৈতন্যের মৃত্যু ঘটার কথা বলেছেন, জয়ানন্দ বলছেন তোটায় মৃত্যু হয়েছিল তাঁর অর্থাৎ তোটা গোপীনাথে। বৈষ্ণব দাস বলেছেন যে, চৈতন্যের দেহাবসান ঘটল জগন্নাথ মন্দিরে কিন্তু পরেই তিনি একথাও বলেছেন দেহটা তাঁর নিয়ে যাওয়া হল তোটা গোপীনাথে।

এখন দাঁড়াল তবে কি? এ প্রশ্নের উত্তর শোন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের জবানীতে ঃ We may, however, make a reasonable guess as to the fact of the case. Chaitanya was in the Jagannath Temple......when the priests apprehended his end to be near, they shut the gate against all visitors.

তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচ্চাট॥

(চৈতন্য মঙ্গল, লোচন দাস)

This they did to make time for burying him within the temple. If he left the world at 4 p.M.

(তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
চৈতন্য মঙ্গল, লোচন দাস)

the doors, we know were kept closed till 11 P.M. —this time was taken for burying him and repairing the floor after burial. The priests at 11 P. M opened the gate and gave out that Chaitanya was incorporated with the image of Jagannath. So according to one account he passed away at 11 p. M. But better informed people know that he passed away at 4 p. M. (Chaitanya & His age, pp. 259-65)। পরে আরও এক জায়গায় ডঃ সেন যেটা সন্দেহ করেছিলেন সেটা আজ দীনেশবাবুর মৃত্যুর এত বছর পর সত্য বলে প্রকাশিত হল।

কী ছিল তাঁর সন্দেহ ? প্রশ্ন করল আনন্দ।

ডঃ সেন লিখেছিলেন Probably the priests did so with the permission of Raja Prataprudra (Chaitanya & His age)। চৈতন্য চকড়া আজ আমাদের জানিয়ে দিল সেন মশায় মিথ্যা অনুমান করেন নি। কিন্তু এসব কথা থাক্। এখন ভাব তাহলে কী ভীষণ কাণ্ডটা ঘটেছিল সেদিন সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বিশ্ববিখ্যাত প্রাণকেন্দ্র ঐ জগবন্ধুর বড় দেউলের প্রাকারের অভ্যন্তরে আজ থেকে চারশ চুয়াল্লিশ বছর আগে। বিকেল চারটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত জগন্নাথ মন্দিরের সমস্ত দ্বার বন্ধ করে রাখা হল। এমন কাণ্ড এই মন্দিরের জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি আর দ্বিতীয়বার ঘটেনি কখনও। জগন্নাথ দর্শন-প্রার্থীদের কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হল না। দীনেশবাবু প্রশ্ন করেছেন যদি লোচন দাসের বর্ণনা সত্যই হবে অর্থাৎ চৈতন্যদেব যদি লীন হয়ে গিয়ে থাকেন শ্রীমূর্তির শ্রীঅঙ্গে তাহলে মন্দির দ্বাররক্ষক মন্দিরদ্বার খুলে রাখল না কেন ? সেন মশায় নিজেই উত্তর দিয়েছেন এ প্রশ্নের। তিনি বলেছেন—The answer is a

simple one. the priests would not like to show him dying of fever as an ordinary man. They buried him somewhere under the floor of the temple and would not allow any outsider to enter it until the place was thoroughly repaired and no trace left after his burial.

এইখানেই ডঃ সেনের সঙ্গে আমার মতান্তর। তিনি বোধ করি জয়ানন্দের বর্ণনাকে মনে রেখেই ধরে নিয়েছিলেন মহাপ্রভু প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পরে মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কতকগুলি স্বাভাবিক ব্যাপার চিন্তা করে দেখেন নি। রথের সময় গৌড়দেশ থেকে প্রতিবারের মত সেবছরও নীলাচলে এসেছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, অদ্বৈতাচার্য্য ইত্যাদি বহু ভক্ত ও শিষ্য। পুরীতেও তখন ছিলেন স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ পণ্ডিত, রঘুনাথ দাস, শংকর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ লীলাসহচরবৃন্দ। এটা ত' খুবই স্বাভাবিক যে প্রবল জ্বর নিয়ে চৈতন্যদেব সত্যিই যদি মন্দিরে যেতেন তাহলে এতগুলি ভক্ত, শিষ্য এবং অন্তরঙ্গ সেবকদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে যেতেন। কিন্তু ইতিহাস বলছে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, অদ্বৈতাচার্য্য, স্বরূপ গোস্বামী, রঘুনাথ, জগদানন্দ বা গোবিন্দ এঁদের কেউই চৈতন্যের সঙ্গে সেদিন মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেন নি বা তাঁদের মধ্যে একজনও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন নি শ্রীচৈতন্যের বিলীন হয়ে যাওয়ার অথবা দেহত্যাগ করার দৃশ্যটি। এর অর্থ কি? যে পার্ষদরা শ্রীচৈতন্যের সুস্থ থাকা অবস্থাতেও অষ্টপ্রহর তাঁর পাশে পাশে থাকত, মুমূর্ষ চৈতন্যদেবের প্রবল জ্বরাক্রান্ত অবস্থাতেও তাঁদের একজনও রইল না তাঁর পাশে। কোন যুক্তিবাদী মন কি এমন উদ্ভট একটা কাণ্ডকে সত্য বলে মেনে নিতে রাজী হয় কখনও? বিশেষ করে মহাপ্রভুর মানসিক ভারসাম্য বিধ্বস্ত হওয়ার পর

থেকেই যখন গোবিন্দ, শঙ্কর পণ্ডিত এবং স্বরূপ দামোদরকে আমরা সবসময়েই দেখতে পাই চৈতন্যের চতুর্দিকে সসতর্ক প্রহরায় প্রায় অতন্দ্র অবস্থায় কালযাপন করতে। আর এ প্রশ্নটাও সকলের মনে স্বাভাবিকভাবেই উঠবে যে প্রবল জ্বরে মৃতপ্রায় তাঁদের প্রাণের প্রভুকে স্বরূপ, শংকর, গোবিন্দ, রঘুনাথ এরা একা একা মন্দিরে যেতে দেবেনই বা কেন? তাছাড়া মুমূর্ষু যিনি ···তিনি কি পারেন গম্ভীরা থেকে কীর্ত্তন করতে করতে মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করতে? সুতরাং জ্বরের আক্রমণে যে শ্রীচৈতন্যের শ্রীমন্দিরের মধ্যে মৃত্যু ঘটেনি সে বিষয়ে যে কোন ঐতিহাসিক সামান্য একট সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহার করলেই সুনিশ্চিত হতে পারবেন আশা করি। চৈতন্য চকড়া যা বলছে এবার সেটা লক্ষ্য কর। বৈষ্ণবদাস লিখেছেন কীর্ত্তন করতে করতে মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। এর পরে চৈতন্য চকড়ার বর্ণনানুসারে আমরা দেখতে পাই সেই সুস্থ কীর্ত্তন-নর্তন-মত্ত মহাপ্রভুকে গরুড় স্তম্ভের পেছনে মৃতাবস্থায় পড়ে থাকতে! Oh how heartless and ruthless were those conspirators! একটা প্রাণচঞ্চল প্রেমে মত্ত মানবতাবাদী পরমপুরুষকে ওরা হিংস্র পশুর মত......বলতে গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হলেন প্রভুজী। কিছুক্ষণ সময় তাঁর অতিবাহিত হল নিজের ক্ষুব্ধ অশ্রুকে সংবরণ করতে। পরে যখন অনেকটা সামলে নিতে সক্ষম হলেন নিজেকে তখন আস্তে আস্তে কিছুটা যেন নিজেকেই নিজে বললেন no, no, no I shouldn't go so far now হাতে আমার এখনও যে নিশ্চিত দু'টি প্রমাণ আসতে বাকী আছে।

উৎকণ্ঠিত আগ্রহে এই আশ্চর্য মানুষটির প্রতিটি কথা উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল আনন্দ এতক্ষণ। বৃদ্ধকে একেবারে নীরব হতে দেখেই সে অধৈর্যের সুরে জিজ্ঞেস করল--বেশ ত', কেমন করে চৈতন্যদেবের জীবনে যবনিকা নেমে এসেছিল সে কথাটা এই

মুহূর্তে বলতে যদি আপনার আপত্তি থাকে না-ই বললেন। কিন্তু তাঁর মরদেহটার কী হ'ল সেটুকু অন্ততঃ আজ বলুন দয়া করে।

ধমক দিয়ে উঠলেন প্রভুজী কপটক্রোধে। বললেন—দয়া করে? যার হাতে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস আর আশ্বাস নিয়ে তুলে দিয়েছি আমার নিজের এতদিনকার ব্যবহার করা সেই কলম, যে কলমে স্পর্শ লুকিয়ে আছে চৈতন্যগত হৃদয় খগেনবাবুর, সে আমার কাছে চাচ্ছে দয়া? আমিই যে তোমার দয়ার ভিখারী গোবর্দ্ধন। ছ' বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষায় পাওয়া আমার সমস্ত কিছু তুমি দয়া করে গ্রহণ করে আমায় ছুটি দাও এবার। আমি যে বৃদ্ধ অথর্ব হয়ে পড়ছি দিনে দিনে।

এসব কি বলছেন আপনি প্রভুজী?

ঠিকই বলছি গোবর্ধনবাবু। সবত শোনাতেই হবে তোমাকে। না শোনালে আমি ছুটি পাব কেমন করে? কিন্তু আজ নয়। আমি ফিরে আসি রাজমহেন্দ্রী থেকে মহাপ্রভুর কাছে লেখা রায় রামানন্দের সেই পত্রটি নিয়ে। যে পত্রে মহাপ্রভুর কয়েকজন ভক্তের নাম উল্লেখ করে মহাপ্রভুকে তাদের সম্পর্কে সাবধান হতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন রায় রামানন্দ। লিখেছিলেন—ঐ ভক্তরা আসলে ভক্তই নয়, ওরা গোবিন্দ বিদ্যাধরের ঐ পাপচক্রের চর।

তাই নাকি? এমন কোন পত্র সত্যিই লিখেছিলেন নাকি রায় রামানন্দ?

লিখেছেন ত' বটেই। ও পত্রের অনুলিপি আমার হাতে পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যেই। এখন যাচ্ছি আসল পত্রটি উদ্ধার করতে। তাই বলছিলাম তোমাকে just wait for a fortnight। আমি ফিরে এসেই তোমাকে বিশদভাবে বর্ণনা দেব কেমন

করে ছুঃখী-তাপী-ত্রাতা গৌরাঙ্গকে ত্যাগ করতে হয়েছিল ইহলোক, — কোথায় কেমনভাবে অদৃশ্য হ'ল তার দেহখানি। আমি ত' সব জেনে গেছি, সব বলে দিতে পারি এখনই। কিন্তু ইতিহাসের দাবীত, আগে মেটাতে হবে। হাজির করতে হবে সাক্ষী, তথ্য, প্রমাণ।

এই বলে হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়েই প্রায় লাফিয়ে উঠলেন প্রভুজী। বললেন—আর দেরী নয় মা মণি, গাড়ীর সময় যে হয়ে এল প্রায়।

॥ ছয় ॥

প্রভুজীর মুখ থেকে গৌরাঙ্গ-জীবন নাট্যের শেষ অঙ্কের যে বিশদ বর্ণনা শুনেছিল আনন্দ, তা তার মনে যে কেবল গভীর রেখাপাতই করেছিল তাই নয়, সারা অন্তর তার উদভ্রান্তের মত খুঁজে ফিরতে চাচ্ছিল শুধু সেই স্থানটি যে স্থানে একদিন চারশ চুয়াল্লিশ বছর আগে এই পৃথিবীর সর্বকালের সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে লক্ষ ভক্তের চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে কঠিন মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করা হয়েছিল নিঃশব্দে, নির্দয় প্রতিহিংসা আর নিদারুণ অবহেলায় অবগাহন করিয়ে। সন্ন্যাস নেবার প্রাক্-লগ্নে যাঁর হাত ধরে বিধবা মা শচীদেবী কাঁদতে কাঁদতে বার বার মিনতি জানিয়েছিলেন—

না যাইয় না যাইয় বাপ্, মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া ॥

(চৈঃ ভাঃ, মঃ ২৭।২২)

যাঁর সন্ন্যাসগ্রহণ মুহূর্তে চতুর্দশ বর্ষীয়া কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকফাটা হাহাকার অনবদ্য ছন্দে গ্রথিত করে গেছেন মরমী বৈষ্ণব কবি লোচন দাস—

'এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া শিরে মারে করাঘাত ॥
এ মোর প্রভুর সোনার নূপুর, গলার সোনার হার।
এ সব দেখিয়া মরিব কুরিয়া, জিতে না পারিব আর ॥

যাঁকে চাক্ষুষ দর্শন করে এসে তাঁর শারীরিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি জানাবার জন্য পতিবিরহকাতরা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রায়ই নীলাচলে

পদব্রজে পাঠাতেন নিজ সমবয়সী সখি ব্রাহ্মণকন্যা কাঞ্চনাকে (স্বামী সারদেশানন্দ রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, পৃঃ ৫৪২)। সেই অভাগিনী জননী-জায়ার প্রাণের নিধি হৃদয়ের ধন কোথায় কোন মাটির নীচে শুয়ে রইল চিরদিনের মত, সে খবর কেমন করে কার কাছে পাবে আনন্দ? রাজমহেন্দ্রী থেকে ফিরতে যতই দেরী হতে লাগল প্রভুজীর, আনন্দের সমস্ত মন ততই অধীর অস্থির হয়ে উঠতে লাগল নবদ্বীপের বিশ্বম্ভরের সমাধিস্থানটি খুঁজে বের করার ব্যাকুল ব্যগ্রতায়। কিন্তু কে? কে দেবে তাকে সে সন্ধান?

মাঝে মাঝে মনে হয় প্রভুজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী মাধবী হয়ত জানে সে জায়গাটির কথা। হয়ত পরম স্নেহের পাত্রী মাধবীকে কোন এক ভাব-বিহ্বল মুহূর্তে দেখিয়ে থাকবেন চৈতন্যব্রতী প্রভুজী চৈতন্য-দেবের শেষশয্যার সেই অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত স্থলটি। কিন্তু যে কথা প্রভুজী শোনাতে গিয়েও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন রাজমহেন্দ্রী যাত্রার রাত্রে, শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিলেন Just wait for a fortnight. আমি ফিরে এসেই তোমাকে বিশদভাবে বর্ণনা দেব কেমন করে দুঃখীতাপীত্রাতা গৌরাঙ্গকে ত্যাগ করতে হয়েছিল ইহ-লোক, আর কোথায় কেমনভাবে অদৃশ্য হল তার দেহখানি। সে কথা নিজের জানা থাকলেও আনন্দকে বলতে রাজী হবে কি বৈষ্ণবী? সে কি বাপির অমতে কোন কাজ করবে কখনও? নাকি, আনন্দেরই উচিত হবে প্রভুজীর অনুপস্থিতিতে বৈষ্ণবীকে এই ধরণের প্রশ্ন করা?—তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে—

এখন পর্য্যন্ত আনন্দ জানেই না মাধবী ও প্রভুজীর আস্তানাটা কোথায়? কোন ব্যাপারেই অকারণ কৌতূহল প্রদর্শন তার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই প্রভুজীর পুরীর আবাস জানতে চাইতে দ্বিধাবোধ করেছে সে।

আজ মনে হচ্ছে ওটা জানা থাকলেই ভাল হত হয়ত।

প্রভুজী রাজমহেন্দ্রী যাওয়ার পর আটদিন কেটে গেছে। এর

মধ্যে বৈষ্ণবী একবারও খোঁজ নেয় নি তার। অথচ আনন্দ যে কোথায় থাকে মাধবীর তা অজানা নয়।

কিন্তু সে কথা ভেবে এখন লাভ নেই। আসুন প্রভুজী ফিরে, তারপর আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে ওঁদের সঙ্গে।

এই আটদিন অবশ্য নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি আনন্দ। প্রাচীন পুঁথির সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে সে পুরী এবং পুরীর বাইরের অনেক মঠে মন্দিরে। বড় ওড়িয়া মঠ, গঙ্গামাতা মঠ, আই তোটা, তোটা গোপীনাথ, বালিঘাট মঠ—যেখানেই গেছে তালপত্রের পুঁথির খোঁজে, সেখানেই প্রশ্ন করেছে প্রাচীনদের—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দেহাবশেষ কোথায় রাখা হয়েছে। কিন্তু জবাব পায়নি কারুর কাছ থেকেই। ডাঃ বসন্ত কুমার নন্দ শ্রীক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বাস করছেন প্রায় চল্লিশ বছর। তিনি গুণ্ডিচা বাড়ীর একটি বিশেষ স্থান দেখিয়ে জানালেন আনন্দকে—প্রতিবছর রথের সময় রামদাস বাবাজী পুরীতে আসার পর ঠিক এই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কীর্তন করতেন আর অবিরাম কাঁদতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ওঁর বোধ হয় ধারণা জন্মেছিল মহাপ্রভু এখানেই কোথাও শেষ শয়ন পেতেছিলেন। (গুণ্ডিচাবাড়ীর কথা চৈতন্য চরিতের উপাদানের রচয়িতা বিমানবিহারী মজুমদার মশাই এবং চৈতন্যমঙ্গলের প্রণেতা লোচন দাস)।

ভক্ত-আর্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন।
গুঞ্জবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হইল অদর্শন ॥

(চৈঃ মঃ, পৃঃ ১১৬-১১৭ অন্তখণ্ড)

উভয়েই অবশ্য বলেছেন তাঁদের প্রণীত গ্রন্থে। লোচন দাস এঁকেছেন মহাপ্রভুর জগন্নাথ সঙ্গে বিলীন হওয়ার চিত্র। আর বিমান বাবু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন লোচন দাসের ঐ বিবরণে। তাঁর আশঙ্কা মহাভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য চৈতন্যদেবকে হয়ত কোন দুষ্কৃতি-কারী স্বার্থান্বেষী গোপনে হত্যা করে ঐ গুণ্ডিচারই কোনও এক কোণে পুঁতে ফেলেছিল সকলের অগোচরে। কিন্তু মজুমদার মশাই

তাঁর এই উক্তির পেছনে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে এমনই আমতা আমতা করেছেন প্রতি পদক্ষেপে যে, পড়লেই পাঠকের মনে হবে লেখক যা লিখছেন তা তাঁর অন্তরের প্রত্যয়ের রঙে রাঙানো নয়, কোথায় যেন একটা সংশয়ের সুর গুমরে গুমরে উঠছে ওঁর বক্তব্যের মধ্যে।

কিন্তু চৈতন্য হত্যার অভিযোগ তুলে কোথাও একটুও আড়ষ্টতা নেই ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এবং প্রভুজীর কণ্ঠে !

বিশেষ করে, অমিতস্মৃতিশক্তিধর অনলসকর্মা হৃদরোগে জর্জর বৃদ্ধ প্রভুজীর প্রতিটি যুক্তিই ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীতে অনেকটাই অকাট্য বলে মনে হয় যেন। রাজতরঙ্গিনীতে কলহন বলেছেন—ভাল ঐতিহাসিক হতে গেলে, তাকে ভাল কবিও হতে হবে। একথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন—কলহনের কথার অর্থ প্রকৃত ঐতিহাসিককে প্রখর কল্পনা-শক্তির ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতেই হবে কবিদের মত, তবেই সে পাবে ইতিহাস খনির গহ্বরে লুক্কায়িত সত্য-রত্নের সন্ধান। আনন্দের মনে হল সুদীর্ঘকাল আমেরিকায় অধ্যাপনা করেছেন যে মানুষটি, সেই প্রভুজীর মন যে বিজ্ঞান-সম্মত বাস্তববাদী ও বিশ্লেষণ-ধর্মী হবেই সেটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই কেবল ঐ দুটি কারণেই নয়। তিনি সত্যিই এক প্রখর কল্পনা শক্তি ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ইতিবৃত্ত গবেষক যাঁর সত্যসন্ধ অনুভূতি কোন সংস্কারান্ধ গলিপথে বিচরণ করে না কখনই, যিনি তাঁর এষণালব্ধ ফলশ্রুতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে লোকনিন্দা এবং জনপ্রশস্তি এই দুটি বস্তুকেই একই রকমভাবে তুচ্ছজ্ঞান করেন। নীহারবাবুর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও ঠিক এই ধরণেরই দৃপ্ততার ব্যঞ্জনাই যেন মর্মরিত।

জর্জ বার্ণাড শ'য়ের লেখা একটি কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আনন্দের।

Common sense is instinct, enough of it is genius. এমন খাঁটি কথা এই ছুনিয়ার ক'জন লেখকই বা এমন সহজ করে বলতে পেরেছেন! কোন প্রতিভাধর ঐতিহাসিকের ক্ষেত্রে একথাটা মনে হয় বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। সুদূর অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর সত্যসমৃদ্ধ অংশটাকে কেবল সঠিকভাবে নির্বাচন করে জিজ্ঞাসুমহলে তা পরিবেশন করতে গিয়ে যে ঐতিহাসিক তাঁর সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি যত বেশি প্রয়োগ করে থাকেন কালের বিচারে দেখা যায় সেই ঐতিহাসিককে তার উত্তর-সুরীরা ঠিক তত বড় প্রতিভাবান বলেই স্বীকৃতি দান করে থাকে যুগে যুগে। প্রভুজীর বিশ্লেষণভঙ্গীর বাঁকে বাঁকে সেই অসাধারণ বুদ্ধিরই ঝিলিক যেন সুস্পষ্ট।

কিন্তু কে এই প্রজ্ঞাউজ্জ্বল বৃদ্ধ? কী তাঁর আসল পরিচয়? এখন পর্য্যন্ত তাঁর আসল নামটিও যে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে আনন্দের কাছে। কী অবিশ্বাস্য রকমের আত্মপ্রচার বিমুখ ঐ মানুষটি!

পুরীর বড়দেউলের (জগন্নাথ-মন্দির) পশ্চিমদ্বারের দ্বিতীয় তোরণে প্রবেশের পথে বাম ও দক্ষিণ উভয়দিকে জগন্নাথদেবের ফুল-তোটা (ফুল বাগান) তারই উত্তর পূর্ব কোণে যে-গৃহে শ্রীবিগ্রহের পুষ্পমাল্য ও আভরণাদি তৈরী হয় তারই অদূরে একাকী বসে এই সব নানা কথা ভাবছিল আনন্দ জ্যৈষ্ঠের আসন্ন সন্ধ্যায়।

হঠাৎ, বামদিকের বাগানে বিরাজিত ধবলেশ্বর মহাদেবের কাছাকাছি থেকে ছুই পুরুষ কণ্ঠের তীব্র বাদবিতণ্ডার আওয়াজ কাণে আসতেই চিন্তাচ্ছন্নতাটুকু ছুটে গেল মুহূর্তে। স্পষ্ট শুনতে পেল আনন্দ কে যেন গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে—যান্ যান্ মশাই, একটা ইউরোপীয়ান মন্দিরের বেষ্টনের মধ্যে ঢুকেছিল বলে যে জগন্নাথকে মহাস্নান করতে হয়েছিল, (সুন্দরানন্দ বিগ্যাবিনোদ রচিত শ্রীক্ষেত্র ৯২ পৃঃ) সেই জগন্নাথকে আবার ভগবান বলতে হবে? সঙ্গে সঙ্গে অপর কণ্ঠ কর্কশ স্বরে ঝাঁঝিয়ে উঠল আপনার মত প্যাণ্টকোট ধারী

একটা ম্লেচ্ছ জগন্নাথকে ভগবান না বললেও ভগবান পুরুষোত্তম ভগবানই থাকবেন বুয়েচেন?

বুঝেছি মশাই, বুঝেছি। প্রথম কণ্ঠ পুনশ্চ গাঁক্ গাঁক্ করে উঠল, বেশ ভাল রকমই বুঝতে পেরেছি যে, আপনাদের মত কতকগুলো কূয়োর কোলা ব্যাঙ নিজেদের ব্যাঙমার্কা নির্বুদ্ধিতার আরকে চুবিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মানুষপশুপক্ষী কীটপতঙ্গের স্রষ্টা ত্রিভুবনেশ্বরকে একটা ছুঁচিবায়ুগ্রস্ত ঠুন্‌কো ক্লীবে পরিণত করেছেন। তাই, জগতের নাথ যিনি, তাঁরও কথায় কথায় জাত যায়, তাঁকেও করতে হয় প্রায়শ্চিত্ত স্নান। আমি মানি নে আপনাদের ঐ জগন্নাথকে, আমি মানি জগন্নাথের ব্যাটাকে।

জগন্নাথের ব্যাটা? সেটা আবার কে? দ্বিতীয় কণ্ঠের বিস্মিত প্রশ্ন।

তাও চেনেন না? জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে নিমাই পণ্ডিত। সিংহ লগ্ন, সিংহরাশিতে জন্ম হয়েছিল বলে যে ছিল সত্যিকার একটা পুরুষ সিংহ। জাত বেজাতের ধার ধারেনি সে কখনও। চাঁড়াল ডোম মুচি ম্যাথর কেউই তার কাছে অস্পৃশ্য ছিল না। ভিন্নধর্মী মুসলমান তাকেও সে নিজের বুকে টেনে নিতে কারুর পরোয়া করেনি তখনকার সংস্কারান্ধ সমাজেও। তাই আমার মহাপ্রভু জাতি ভেদাভেদ বিরোধী মহান বিপ্লবী নিমাই পণ্ডিত, আপনাদের ঐ মন্দিরে ইংরেজ ঢুকলেই জাতরক্ষা করতে মহাস্নান করতে হয় যে জগন্নাথকে, সেই জগন্নাথ নয়, বুঝলেন?

বিতর্কের বিষয়বস্তু আনন্দকে এক-প্রকার আকর্ষণ করেই নিয়ে গেল যেন ধবলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পাশে। ফর্সা গায়ের রং দোহারা চেহারার পক্বকেশ এক কেতাদুরস্তভাবে স্যুট টাই-এ সুসজ্জিত ভদ্রলোককে যে বিরলকেশ তিলক কণ্ঠিধারীর সঙ্গে তর্কোন্মত্ত অবস্থায় দেখতে পেল আনন্দ, তাকে এক নজরেই কিন্তু চিনে নিতে কষ্ট হল না একটুও। এবার নীলাচলে আসার সময়ে

জগন্নাথ এক্সপ্রেসের ফার্ষ্ট ক্লাসের সেই অন্যতম আপার বার্থের যাত্রী পরম বৈষ্ণব শান্তিপ্রিয় সেন। শান্তিপ্রিয়র জ্বলন্ত দৃষ্টি তখন কেবল ঐ সম্ভ্রান্ত চেহারার স্যুট-পরা ভদ্রলোকের ওপরেই নিবদ্ধ। নাকের তিলক কুঁচকে দুই হাত নেড়ে বলে উঠল সে, 'জগন্নাথের মন্দিরে দাঁড়িয়ে বলছেন কিনা জগন্নাথ দেব মহাপ্রভুই নন, মহাপ্রভু কেবল ঐ রাধা-ভজা নিমাই? আপনার স্পর্ধা ত মশাই কম নয়?

আর, আপনি আবার কেমন বোষ্টম মশাই? তেলক টেনেছেন নাকের ডগা থেকে টাকের তালু পর্য্যন্ত অথচ নিমাইকে বলছেন রাধা ভজা?' 'আমি মধ্ব-ঘেষা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নই, আমি শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের লোক, একেবারে নির্ভেজাল বৈষ্ণব-বুয়েচেন?

তাই বলে অতবড় একজন ধর্মবিপ্লবীকে আপনি না বুঝে না শুনেই রাধাভজা বলে অপমান করবেন?

'বিপ্লবী? কে বিপ্লবী? শ্রী রাধিকা নিমাই? হাঃ হাঃ হাঃ অলাবু তুল্য চর্বিসর্বস্ব-উদর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে তাচ্ছিল্যের অট্টহাসি হাসতে লাগল শান্তিপ্রিয় সেন। অথচ ট্রেনের কামরায় বসে এই লোকটাই বলেছিল স্বয়ং ভগবান বলে আমরা যে মহাপ্রভুকে গ্রহণ করেছি এবং প্রচার করেছি, তাঁর অলৌকিক অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে সামান্যতম সংশয় প্রকাশ করাটাও, যে কোন বৈষ্ণবের চোখেই একটা অমার্জনীয় অপরাধ! সেই মানুষের মুখেই চৈতন্যদেব আজ আর শ্রীভগবান নন, তিনি শুধুই রাধা-ভজা, শ্রীরাধিকা নিমাই! লোকটা সেদিন চৈতন্য-ভক্তিতে গদগদ হয়ে কী ভণ্ডামিই না করেছিল সেই চলন্ত গাড়ীর মধ্যে!

হঠাৎ ধমকে উঠলেন এবার টাই-পরা ভদ্রলোক—থামান মশাই আপনার ঐ ঘোড়ার মতন ঘোঁৎঘোতানি হাসি। নিমাই বিপ্লবী ছিল না ত' বিপ্লবী ছিল কে? যে নিজে ব্রাহ্মণকুলে জন্মেও পঞ্চদশ-

যোড়শ শতাব্দীর সেই ভয়ঙ্কর জাত-পাত মানার যুগেও গলা ছেড়ে বলতে পেরেছিল —

মুচি যদি ভক্তি ভরে ডাকে কৃষ্ণ করে।
কোটি নমস্কার করি তাঁহার চরণে।

সে বিপ্লবী নয়? সন্ন্যাস নেবার আগেই যে নিমাই নির্দ্বিধায় দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান করেছিল তার সহধর্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়াকে (সারদেশানন্দ রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব পৃঃ ৫০), সে বিপ্লবী নয়? অন্তরে আদর্শ বৈষ্ণব হয়েও যে শ্রীহট্ট দর্শনে গিয়ে তার বৃদ্ধ পিতামহকে নিজের হাতে লিখে দিয়েছিল 'শ্রীশ্রী চণ্ডী পুস্তক, সে বিপ্লবী নয়? নিমাই লিখেছিল চণ্ডী?' এই বলে পুনশ্চ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে হাসতে যাচ্ছিল শান্তিপ্রিয়, পক্ককেশ ভদ্রলোকের আর এক ধমকে নিরুপায় হয়ে হাসি থামিয়ে সে প্রশ্ন করল বেশ রাগতভাবেই—নিমাই শ্রীশ্রীচণ্ডী লিখেছিল, এ-সংবাদ সরবরাহ করলে আপনাকে কোন রয়টার মশাই?

কে আবার বলবে? প্রাচীন অনেক গ্রন্থেই ত' এর উল্লেখ আছে। শ্রীহট্টের বরগঙ্গা গ্রামে নিমাই এর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র ওড়িশার যাজপুর থেকে প্রথমে গিয়ে আশ্রয় নেন, তার পরে যান ঢাকা-দক্ষিণগ্রামে। সেই বরগঙ্গা গ্রামে চৈতন্যবাড়ী বলে এখনও একটি স্থান আছে। ঐ স্থানেই নিমাই-এর জ্ঞাতি-বংশীয়রা সেই নিমাই-লিখিত শ্রীশ্রী চণ্ডী পুস্তকখানি সযত্নে রক্ষা করে নিয়মিত পূজো অর্চ্চনা করছিলেন মাত্র কয়েক বছর আগে পর্য্যন্ত। কিন্তু অল্পদিন পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী-স্বামী সারদেশানন্দজী খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, জনৈক ধর্মোন্মাদ নাকি ঐ পুস্তকটি অপহরণ করে নিয়ে গেছে (শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব সারদেশানন্দজী কৃত, পৃঃ ১৮)।

তা বলে, সন্যাস নেবার আগে যে নিমাই স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করত নানান আসরে-বাসরে, তাকে আপনি ডাকবেন বিপ্লবী বলে?

ফিমেল রোল করত নিমাই ?

মুখটা বেশ ভাল রকম ভেংচে শান্তিপ্রিয় জবাব দিল—ইয়েস স্যার, ফিমেল রোলে অভিনয় করেছিল আপনার ঐ মহাবিপ্লবী নবদ্বীপ চন্দ্র অনেকবার। চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন না—

কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী কভু বা চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি, ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি !

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কবিকর্ণপুর 'পুরীদাস'ও এখবর লিখে গেছেন, পড়ে দেখে নিতে পারেন। মানলাম আপনার কথা সত্য। কিন্তু দেবী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বলেই নিমাই-এর বিপ্লবাত্মক কাজগুলোর জন্যেও তাকে বিপ্লবী বলা চলবে না—এ আবার কোন মগের মুলুকের আইন মশাই ?

কী বিপ্লবের কর্মটি করেছে নিমাই শুনি ? দেখতে পাচ্ছেন না তার বিপ্লবের ধাক্কায় আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা কী সব বলে বেড়ায়। চৈতন্যচেলারা বলে কালীদুর্গার মুখ দর্শনও নাকি পাপ। আমার এক আত্মীয়া তাঁর নিত্যপাঠের গীতার ওপরে একটি রক্তজবা ফুল রেখেছিলেন বলে, একজন বৈষ্ণব সাধু ক্ষেপে গিয়ে যা মুখে আসে তাই বলে তাঁকে শাপশাপান্ত করেছিলেন।

কিন্তু রামদাস বাবাজীও ত' গৌড়ীয় বৈষ্ণবই ছিলেন। তাঁর উদারতার তো সীমা ছিল না। আমি নিজে তাঁকে দেখেছি কলকাতায় পোস্তার রাজবাড়ীতে দুর্গোৎসবে পৌরোহিত্য করতে।

আস্তে বলুন, মশাই, আস্তে বলুন। এখানে এমন ধাপ্পাবাজি কথা আর দ্বিতীয়বার বলবেন না বুঝেছেন ? রামদাসবাবাজী নাকি দুর্গাপুজোর পুরুত হয়েছিল ! পুরীর ঝাঁঝপেটা মঠ কিম্বা হরিদাস মঠের কেউ যদি একবার শুনতে পায় আপনার মুখ থেকে এমন কথা তাহলে ঝামা ঘষে ছেড়ে দেবে আপনার বোঁচা নাকে, সাবধান।

বেশত আমার কথায় বিশ্বাস্ না হয়, আপনি নিজেই কলকাতার ২৫ নম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডের কুমার বিশ্বনাথ রায়কে জিজ্ঞেস

করে আমার কথার সত্যাসত্য যাচাই করে নিন না? কুমার বিশ্বনাথই তো এখন পোস্তার সমস্ত রাজসম্পত্তির একমাত্র মালিক। এই বলে একটু থেমে কোট-টাই পরিহ্িত ভদ্রলোক আবার বললেন — রামদাস বাবাজী দুর্গোৎসব করার প্রেরণা পেয়েছিলেন ত' আমার ঐ বিপ্লবী মহাপ্রভুর কাছ থেকেই।

তার মানে? তার মানে আপনি বলতে চান চৈতন্যদেবও শক্তিপূজো করেছিল নিজে বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও?'

নিশ্চয়ই। যতবার চৈতন্যদেব গৌড় থেকে উৎকলে এবং উৎকল থেকে গৌড়ে গেছে, ততবারই যাজপুরে বৈতরণী নদী তীরস্থ বিরজাদেবীকে দর্শন ও পূজো করেছে, ভুবনেশ্বরে গৌরীর পূজো ও স্তব করেছে। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় কামকোষ্ঠীপুরে (কণ্ডুকোণম) কামাক্ষী দেবীকে, মাদুরায় মীনাক্ষি দেবীকে, কন্যাকুমারীতে ভগবতী কুমারীকাকে দর্শন, পূজো ও প্রদক্ষিণ করেছে।

পদ্মকোটে দেবী অষ্টভূজা ভগবতী।
সেইখানে গিয়া প্রভু করিলা প্রণতি।
বহুস্তুতি কৈলা তবে মোর গোরা রায়।
দেখিতে তাঁহারে শত শত লোক ধায়।

(গোবিন্দ দাসের কড়চা)

এ সব কথা কি আপনি কোন বইএ পড়ে বলছেন? আকাশ থেকে আছড়ে পড়লেন যেন শান্তিপ্রিয় 'নয় তো কি বানিয়ে বানিয়ে বলছি? একটা যুগের নেতৃত্ব দেবে যে তার হৃদয়কে যে বিরাট হতেই হবে। আদি শঙ্করাচার্য্যের উদার অন্তরের পরিচয় আমরা পাই তাঁর রচিত বিভিন্ন স্তোত্রাবলীতে, তীর্থসমূহ উদ্ধারে, আর, নানা দেবদেবীর মূর্তি-মন্দির প্রতিষ্ঠাতে। সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীর অন্তরের ভাবও নিজ সম্প্রদায় গুরু আচার্য্য শঙ্করের সম্পূর্ণ অনুরূপই ছিল। যে নিমাই সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত, নিষ্পেষিত, অস্পৃশ্য বলে ঘোষিত দুর্ভাগাদেরকেও

নিজের বুকে আশ্রয় দিয়েছিল সিংহ-শৌর্যে, ইসলামধর্মাবলম্বীকে পর্য্যন্ত গ্রহণ করেছিল একান্ত আপনার জন বলে, কোন দেবতা বা দেবীর প্রতি তার বিদ্বেষ থাকতে পারে কখনও? কৃষ্ণের মত মহাদেবকেও ভক্তি করত নিমাই সারা অন্তর দিয়ে।'

মহেশ দেখিয়া প্রভুর আবেশ শরীর।
টলমল করে প্রভু নাহি রহে স্থির।
(চৈতন্য ভাগবত)

নিজহাতে বিল্বদল তুলি প্রভু মোর।
অঞ্জলি দিলেন শিরে প্রেমেতে বিভোর।
(চৈতন্য চরিতামৃত)

ভুবনেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তিতে প্রায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল নদীয়ার গোরাচাঁদ। উদাত্ত কণ্ঠে লিঙ্গরাজ মন্দিরাভ্যন্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে ভুবনেশ্বর শিবের উদ্দেশে যে অপূর্ব স্তবটি পাঠ করেছিল সেই তেজঃপুঞ্জকায় সন্ন্যাসী সেদিন প্রেমাশ্রুতে কপোল ভাসিয়ে, সে স্তবের সবটাই দেখতে পাওয়া যায় মুরারি গুপ্তের লেখা চৈতন্য-চরিত গ্রন্থে, পড়লেই বুঝতে পারবেন আমি মিথ্যা বলি নি। এখন আপনিই বলুন এই নিমাইকে আমি যে মহাপ্রভু বলেছি, জগন্নাথ মিশ্রের সন্ন্যাসী ছেলেকে যে আমি বিপ্লবী বলেছি—সেটা কি ভুল? ভুল কেন হবে? তুমি তো ঠিকই বলেছ মহাপাত্র বাবা। গৌরমণি আমাদের বিপ্লবই ত' এনেছিল এদেশে। কেবল কি তরোয়াল ঘুরালে কিম্বা কামান দাগলেই বিপ্লব হয়? উভয় তার্কিককে সচকিত করে দিয়ে সহসা এক নারী কণ্ঠ এগিয়ে এল ধবলেশ্বর মন্দিরের পেছন দিক থেকে। দিনান্তের অপ্রতুলালোকেও আনন্দের দেখতে কষ্ট হল না এই বার্দ্ধক্যেও আশ্চর্য্য রকমের ধবলাঙ্গী সেই ছোট খাটো চেহারার ভদ্রমহিলাটিকে। ধবধবে সাদা চুলের সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর জ্বল্‌জ্বল্ করছে। কাণে নাকে,

গলায়, হাতে ভারী ভারী সোণার গয়নার ছড়াছড়ি। পরিধানের গৈরিক শাড়ীর চওড়া লাল পাড় পাবকশিখার মত বেষ্টন করে আছে তাঁর সমস্ত শরীর।

তাঁকে দেখে মহাপাত্র এবং সেন উভয়েই সসম্ভ্রমে তর্ক থামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাতেই আনন্দ ভাবল কী ব্যাপার? মহাপাত্র আর সেন দুজনেই ঐ ভদ্র মহিলাটিকে চেনে বলে যেন মনে হচ্ছে!

মহিলা ঐ দু'জনের নিকটতর হলে সেন শুধাল আজ বলবেন ত' মা, চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান-রহস্যের সেই গোপন কথাগুলো? নিমেষে আনন্দের দেহের সমস্ত স্নায়ুগুলি ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল। কী বলছে শান্তিপ্রিয়? সদ্যাবির্ভূতা শুভ্রকেশা মহিলার কাছে শুনতে চাইছে সে চৈতন্য অন্তর্দ্ধানের অতিগোপন কিছু কথা। সত্যিই কি তাহলে এই বৃদ্ধার কিছু জানা আছে সে সম্বন্ধে? ওদিকে মহাপাত্রের চোখেও তখন বিস্ময়ের ছায়াপাত। শান্তিপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি—আশ্চর্য্য! শান্তামায়ির কাছে চৈতন্যের অন্তর্দ্ধান রহস্য জানবার জন্যে আমার মত আপনিও বুঝি এখানে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন? অথচ, আপনিত ঘোর চৈতন্য বিরোধী! সেন তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, আমাকে যেমন আজ বিকেলে এখানে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন মায়ি, আপনাকেও তাহলে উনি ঠিক তেমনই—

যদিও আলাদা আলাদা দিনে তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তবু দু'জনকে আমি ইচ্ছা করেই একই দিনে একই সময় এখানে আসতে বলেছিলাম আজ। ভেবেছিলাম, দু'জনের জিজ্ঞেসার বিষয় যখন একই, তখন, একই দিনে দু'জনা এলে একবার মাত্র আমার বক্তব্য বললেই কাজ চুকে যাবে। কিন্তু এখন দেখছি কাজটা ভাল করি নি। এই বলে কপট গাম্ভীর্যে সদাহাস্যময়ী

তাঁর মুখখানিকে ভয়ানক রকমের গম্ভীর করে তোলার বৃথাই চেষ্টা করলেন।

মহাপাত্র জিজ্ঞেস করলেন—এমন কথা বলছ কেন মায়ি ?

অনেক দুঃখে বলছি বাবা।

কিসের দুঃখ মা ? সেনের প্রশ্ন।

তোমরা দুজনা আজকেই প্রথম পরস্পর পরস্পরকে দেখলে আমার ডাকে এখানে এসে। এখনও কেউ কারো পরিচয়টুকুও ভালভাবে জানবার সুযোগ পাও নি বোধ হয়। অথচ কী ভীষণ তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েছ দুজনেই বল ত'! এটা ত' আমারই দোষ হয়েছে। তোমাদের দুজনকেই একই দিনে একই সময়ে এখানে আসতে না বললে আর এমনটি হত না।

লজ্জিত স্বরে দুই তর্কযোদ্ধা বলে উঠল—না না, সে কি কথা মায়ি, আমরা তর্ক করছি এর জন্য আপনি নিজেকে দোষী ভাববেন কেন ?

বৃদ্ধা বললেন—আরও বেশি নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে এখন এই ভেবে যে, তোমাদের এমন চমৎকার বিতর্কটি আমি এসে থামিয়ে দিলাম। ধবলেশ্বরের পেছনে বসে তোমাদের দুজনের আলোচনা শুনতে ভারী ভাল লাগছিল আমার।

শান্তিপ্রিয় হাত মুখ নেড়ে বোধ করি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাতেই বলল – তা বেশ করেছেন খুব ভাল করেছেন এমন বাজে তর্ক থামিয়ে। ঐ প্যাণ্টকোট পরা ভদ্রলোক বলে কিনা চৈতন্য ছিল বিপ্লবী! যে মানুষ প্রথম যৌবনে মেয়ের পার্ট করে কাটাল, মধ্য যৌবনে নিজেকে শ্রীরাধিকা বলে ঘোষণা করে গর্ব বোধ করল, যে ছিল বাল্যে চ্যাংরা, কৈশোরে ছ্যাব্‌লা আর যৌবনে শুকনা পাণ্ডিত্যের দম্ভে ফুলে ফেঁপে ওঠা একটা আস্ত বেলুন। ভূতে পাওয়া এক রোগীর মত সারাটা জীবন যে ফ্যাচ ফ্যাচ করে কেবল কেঁদেই কাটাল। নিজে কাঁদল, স্নেহময়ী মাকে কাঁদাল,

পতিব্রতা পত্নীকে কাঁদাল, অনুগত ভক্তদের কাঁদাল, কাঁদতে কাঁদতেই যার একদিন ভবলীলা সাঙ্গ হল—সেই মেয়েলী চৈতন্যকে ভদ্রলোক বলছেন কি না পুরুষ সিংহ, মহাবিপ্লবী! নিমাই ত' কেবল কান্নার ধর্মই প্রচার করে গেল।

বেশ জোর গলাতেই এবার প্রতিবাদ করে উঠলেন মহাপাত্র। নিমাই চরিত্রের কিছুই বোঝেন নি আপনি। তাই অমন—

মাঝপথেই হুঙ্কার দিয়ে থামিয়ে দিল সেন মহাপাত্রকে। বলল—রাখুন মশাই রাখুন। আপনার ঐ বিপ্লবীটির জীবনী আলোচনা যদি করে কোন তরুণ, তাহলে মন তার ভরে ওঠে বিষণ্ণ অবসাদে, আসে কর্মবিমুখতা। বলিষ্ঠ যুবকও ক্লীবে পরিণত হয়ে অসমর্থ হয় আত্মরক্ষায়।

এ সব কী যা তা বলছেন আপনি একজন যুগাচার্য্য সম্বন্ধে? মহাপ্রভুর উপরে লিখা প্রাচীন গ্রন্থের তাহলে কিছুই পড়েন নি দেখা যাচ্ছে! মহাপ্রভু ছিল ক্লীবত্বের জন্মদাতা? ছিল মেয়েলি? একটু হাসলেন মহাপাত্র ঠোঁট বাঁকিয়ে। তারপর পুনরায় শুরু করলেন, স্মার্ত আর জড়-সর্বস্বদের মতের বিকৃত লেন্সটা চোখ থেকে নামিয়ে রেখে যদি একবার নিজের অকৃত্রিম দৃষ্টি মেলে চাইতে পারেন সেই অলোক সাধারণ দিব্যোন্মাদ মহাপুরুষের জীবনালেখ্যের দিকে, দেখতে পাবেন শৈশবেই তার অনন্য প্রতিভার জ্বলন্ত স্বাক্ষর সে রেখেছিল তার প্রতিটি কথায়, প্রতিটি কর্মে—যা দেখে পারিপার্শ্বিক সকলেরই বিস্ময়ের আর অন্ত ছিল না। অগ্রজ বিশ্বরূপ মাত্র ষোল বছর উত্তীর্ণ হতেই সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেল। নিমাই তখন সবে আট-এ পা দিয়েছে। গুণবান যোগ্য পুত্রের গৃহত্যাগ মিশ্রদম্পতি শোকে যখন মূহ্যমান, তখন ঐ আটবছরের কচি নিমাই কী বলে বাবা-মাকে প্রবোধ দিয়েছিল মনে আছে? সে বলেছিল, দাদা সন্ন্যাসী

হয়েছেন তাতে কী হয়েছে? আমি ঘরে থেকে তোমাদের সেবা করব। তিনি সন্ন্যাসী হওয়াতে ভালই হয়েছে। পিতৃকুল মাতৃকুল দু' কুলই উদ্ধার হবে তাঁর পুণ্যবলে। এমন সান্ত্বনাবাক্য শোনাতে পারে যে ছেলে মাত্র আট বছর বয়সে, তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আপনি বললেন কি না সে বাল্যে ছিল চ্যাংরা? এর পর কয়েক বছরের মধ্যেই হল পিতৃবিয়োগ। সেই অল্প বয়সেই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধের উপর পড়লেও নিমাই কিন্তু একটুও দুর্বল বা কাতর হল না। সে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম, গৃহ দেবতা রঘুনাথের সেবাপূজা, অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, শোকার্তা জননীর সেবা-শুশ্রূষা, ঘর-সংসার রক্ষা ও নিজেদের খাওয়া থাকা প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কাজ যথারীতি চালিয়েও খুব মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়াতে একেবারে ডুবে গেল। কৈশোরের আরম্ভেই তার মেধা আর প্রতিভায় সারা নবদ্বীপের পণ্ডিতমহল স্তম্ভিত। তর্কযুদ্ধে নিমাই-এর কাছে একের পর এক পণ্ডিত যতই পরাজিত হতে লাগল, নিমাই-এর সুখ্যাতি ততই পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়তে শুরু হল চতুর্দিকে। মাত্র ষোল বছর বয়সে নিজেই টোল খুলে অধ্যাপনা আরম্ভ করতে পারে যে বালক, তার সম্বন্ধেই আপনি বললেন কি না কৈশোরে ছিল সে ছ্যাবলা? আবার বলছেন সে ছিল মেয়েমার্কা ছিঁচ্‌কাদুনে। কাঁদতে কাঁদতেই তাঁর নাকি ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল। ভাল করে পড়ুন মশাই। আগে ভালভাবে গভীরে ঢুকে বুঝতে চেষ্টা করুন সেই পুরুষ সিংহকে। বহুদিন আগে আচার্য্য কেশব সেনের প্রেরণায় পণ্ডিত ঈশ্বর গুপ্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনেক প্রাচীন পুঁথি ঘেঁটে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটির একটি নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেটা একটু মন দিয়ে পড়লেই দেখতে পাবেন কী লিখেছেন নিমাই সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাতে। পুরুষসিংহ কেবল কি আমি বলছি? বলেছেন চৈতন্যচরিতামৃতকারও। তিনি বলেছেন—

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে॥

সে যখন জয়ধ্বনি করত, তার সিংহনাদে গগন বিদীর্ণ হত। সিংহবিক্রমে সে যখন কীর্তনে নৃত্য করত তখন তার পদভরে মেদিনী টলমল করত। কেবল কি তাই? দেহের গঠনও ছিল ঠিক তার কেশরীরই মত। তার গ্রীবা, বক্ষঃস্থল, কটিদেশ একমাত্র পশুরাজের সঙ্গেই উপমার যোগ্য ছিল—

তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥
(চৈতন্যচরিতামৃত)

এই পুরুষ সিংহই একাধারে সন্ন্যাসী আর বিপ্লবী।

সন্ন্যাসী? কাকে সন্ন্যাসী বলছেন মশাই? আপনার ঐ মহাপ্রভুকে? শঙ্করাচার্য্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের একজনের কাছ থেকে সন্ন্যাস নিলেও সন্ন্যাসীদের মত নিয়মনিষ্ঠা মেনে চলেছিল কি সে কস্মিনকালে? দশনামীদের মত বেদান্ত বিচার করত কখনও? দশনামীদের মত সে কি কখনও জীব-জগতের কারণ মূল সত্তাকে এক অখণ্ড অদ্বয় নির্বিশেষে পরব্রহ্ম বলে মানত? দশনামী সম্প্রদায়ের পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য সন্ন্যাসীদের মত জীবন যাপন তাকে কেউ করতে দেখেছে কোনদিন? সে ত' ছিল আমারই মত এক বোষ্টম। কত ছবিতে দেখেছি আপনার ঐ সন্ন্যাসী বিপ্লবীর গলায় তুলসী মালা, কপালে হরিনামের ছাপ আর তিলক, ন্যাড়া মাথায় ইয়া বড় টিকি। এই কি দশনামীর সাজ?

ব্যস্, ব্যস্! একসঙ্গে একরাশ প্রশ্ন ছাড়লে জবাব দেব কেমন করে? যে ছবির কথা বললেন আপনি এখনই, সে ছবিগুলির

স্রষ্টা হচ্ছে মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগের কয়েকজন একদেশদর্শী গোস্বামীবাবাজী। তাঁরা চেয়েছিলেন চৈতন্যকে নিজেদের সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে। দেখুন না, মহাপ্রভুর অনুগামী বলে পরিচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা মহাপ্রভুকে মাধ্বাচার্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। আবার অন্য একদল প্রচার করেন তাকে নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত কেশব নামে জনৈক বৈষ্ণবের শিষ্য বলে। কিন্তু আসলে মহাপ্রভু ত' কোনদিন বৈষ্ণবই ছিল না।

শান্তামায়িকে লক্ষ্য করে এবার চিল্লে উঠল কণ্ঠিতিলকধারী শান্তিপ্রিয় সেন—শুনছেন মায়ি, শুনছেন—কী মারাত্মক কথা বলছেন ঐ সবজান্তা ভদ্রলোক। বলছেন মহাপ্রভু আসলে নাকি বৈষ্ণবই ছিল না। তবে কি সে শৈব, শাক্ত কিম্বা গাণপত ছিল?

শান্তা দেবী স্মিত হাস্যে শান্ত কণ্ঠে জানালেন—তোমাদের এই সুন্দর বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে না গিয়েও একটা কথা এখানে জানিয়ে রাখা হয়ত অন্যায় হবে না— আমাদের প্রাণের গৌরাঙ্গের জন্ম হয়েছিল কিন্তু শাক্ত বংশেই। মিশ্র বংশ ছিলেন শক্তি উপাসক (সারদেশানন্দ রচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব, প্রস্তাবনা, একুশ)।

বলেন কি মা? আপনি ঠিক জানেন—মিশ্রবংশ শাক্ত ছিল? সেনের অবিশ্বাস। জেনেই ত' বলছি বাবা! মায়ির উত্তর।

মহাপাত্র বললেন—আমার বক্তব্য কিন্তু মা খুবই পরিষ্কার। চৈতন্য ছিল একজন খাঁটি দশনামী সন্ন্যাসী। দশনামী সম্প্রদায়ী কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নেবার অনেক আগেই মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেছিল সে আর একজন দশনামী সাধকেরই কাছ থেকে— যাঁর নাম ছিল শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরী। নিমাই যথাবিধি আত্মশ্রাদ্ধ, শিখামুণ্ডন, সূত্রবর্জন করেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে সারাটা জীবন ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছিল আদর্শ সন্ন্যাসীর মত, সন্ন্যাসী-সংঘে

সন্ন্যাসীদের সঙ্গে থেকে। সন্ন্যাসীর সনাতন আদর্শ সম্বন্ধে লিখেছেন বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাসীর গীতিতে—

গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ, শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস,
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও, সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও।

মহাপ্রভুর জীবনী যদি খোলা মন নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে স্পষ্টই দেখা যাবে—সে এই সনাতন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি মুহূর্তের জন্যেও। আর, বেদান্ত বিচারের কথা? পুরীতে বাসুদেব সার্বভৌম এবং কাশীতে প্রকাশানন্দ স্বামীর সঙ্গে বিচারের কথা আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যাবে কী গভীর জ্ঞান ছিল তার বেদান্তবিষয়ে। আচার্য শঙ্করের মত মহাপ্রভুও ত' জগৎকারণকে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু বলেই পরিচয় দিয়েছে।

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, আ।২)

চৈতন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে—বাক্যমনের অতীত যে বস্তুকে ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে উপনিষদ অদ্বৈতব্রহ্ম বলে তাঁর আভাসমাত্র দিয়েছে, সমবিধান যোগীরা যাঁকে পরমাত্মা রূপে নির্দেশ করেছেন, ভক্তগণ যাঁর অবিচিন্ত্য শক্তিতে মোহিত হয়ে ভগবানরূপে ভজনা করে, সেই সর্ব কারণের কারণ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ—এক অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু।'

তাই বলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল যার প্রভাবে তাকে আপনি বৈষ্ণব বলে স্বীকারই করেন না?

না। বৈষ্ণব বলতে আজকের দিনে আমরা যা বুঝে থাকি, চৈতন্য তা কখনও ছিল না। বলেছি ত', সে ছিল সর্বজীবে সমদর্শী এক ত্যাগব্রতী আদর্শ সন্ন্যাসী। সে তার অনুগামীদের শিক্ষা দিত—

মহানুভবের হয় এই তো লক্ষণ।
সর্বত্রেতে হয় তাঁর ইষ্ট দরশন॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তাঁর মূর্তি।
সর্বত্রেতে হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

চৈতন্য স্বয়ং বহুবার বহু জায়গায় নিজেকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলে ঘোষণা করেছে বিনা দ্বিধায়। প্রথম পরিচয় মুহূর্তে রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্তা রায় রামানন্দের কাছ থেকে ভক্তির উচ্চতত্ত্ব ও ভজনপ্রণালী জানবার আগ্রহে—

প্রভু কহে মায়াবাদী আমি তো সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

চৈতন্য প্রায়ই বলত—

দ্বৈত ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব সমোধর্ম।
এই ভাল, এই মন্দ এই সব ভ্রম॥......
আমি তো সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম।
চন্দন পঙ্কজে আমার জ্ঞান হয় সম॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, অ্য।৪)

তবে সে সন্ন্যাসী হবার পর চব্বিশটা বছর কেবল কীর্তনের হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে গেল কেন? সেনের কণ্ঠে ক্ষোভটা যেন অনেকটা থিতিয়ে পড়েছে মনে হ'ল। কেন আবার? বেদান্তে যে জ্ঞানযোগের কথা আছে তা ত' সকলের জন্যে নয়! নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক, ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ, শমদমাদি ষট্-সম্পত্তি, আর মুমুক্ষতা—এই সাধন চতুষ্টয়ের ওপরে যথেষ্ট অধিকার না জন্মালে—বেদান্তের জ্ঞানযোগ যে বোধগম্যই হবে না কারও। সর্বসাধারণের পক্ষে ভগবদুপাসনাই মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। বেদান্ত-প্রচারক আদি শঙ্করাচার্য্যও এই অভিমতই পোষণ

করতেন। চৈতন্যের ব্যক্তিগত বিশ্বাসও ছিল ঐ রকম। তাই, স্বয়ং সন্ন্যাসী হয়েও সাধারণ মানুষের বিশেষ উপযোগী উপাসনামার্গ আর নাম মাহাত্ম্য প্রচার শুরু করলেন তিনি ভারতের দিকে দিকে নাম সংকীর্তনে প্রলয়ঙ্কর বন্যা বইয়ে দিয়ে তার সন্ন্যাস জীবনের প্রায় আরম্ভ-লগ্ন থেকেই।

কিন্তু ঐ যে আপনার মহাপ্রভু দেশের লোককে বিতৃষ্ণা, বৈরাগ্য, অভিমানহীনতা, দীনহীনভাবে কাল যাপনের কথা শেখাল, শেখাল একান্তে অবস্থান করে ভগবদ্‌ভজন করতে—তাতে আমাদের সমস্ত জাতটারই কি অবনতি ঘটল না? আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, বীরত্ব, কর্মপটুতা—সবই কি ঐ উদ্‌ভট্‌ খোল খঞ্জনির হট্টগোলে বিকৃত আর ধিক্কৃত হয়ে যায় নি?

কখনও না।

কিন্তু আমি নিজে পড়েছি স্বামী নিগমানন্দের জীবনীতে—তিনি এই রকম কথাই লিখেছেন।

তা লিখে থাকতে পারেন। এমন কথা আরও অনেকেই লিখেছেন এবং বলেছেন আমি জানি। তবু, তাঁদের কারুর প্রতি কোন প্রকার অশ্রদ্ধাপ্রকাশ না করেই বলব, এমন সিদ্ধান্ত নেবার আগে তাঁরা নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাবলীকে কালের কষ্টিপাথরে যাচাই করার চেষ্টা করেন নি বা করার প্রয়োজনই বোধ করেন নি।

কালের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই ত' দেখা গেল—মহাবীর উৎকল-রাজ প্রতাপরুদ্র কেমন চৈতন্য-সংস্পর্শে আসার পরে তাঁর সাম্রাজ্যের অংশের পর অংশ জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হলেন শত্রুদের শ্রীচরণমূলে। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন, শনিবার (কৃষ্ণদেব রায়ের মঙ্গলগিরি অনুশাসনে উল্লিখিত তারিখ) প্রতাপরুদ্রের সৈন্যদের পরাস্ত করে বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেব রায় কেবল গুণ্টুর (Guntur) জেলার অন্তর্গত কোণ্ডবীড়ু দখলই যে করলেন তাই

নয়, প্রতাপরুদ্রের অন্যতম পুত্র বীরভদ্রকে বন্দীও করলেন অনায়াস প্রচেষ্টায় (কৃষ্ণদেব রায়ের স্বরচিত 'আমুক্ত মাল্যদা' নামক তেলেগু গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। বীরভদ্র তখন ছিল কোণ্ডবীড়ু (Kondabidu) দণ্ডপাটের শাসক (Governor)। ১৫১৭তে কৃষ্ণদেব রায় কোণ্ডপল্লী অধিকার করে প্রতাপরুদ্রের একজন মহিষী, অপর এক পুত্র এবং সাতজন প্রধান রাজকর্মচারীকে কারারুদ্ধ করলেন (History of Orissa, Vol. 1., P 325)। এইবার অবস্থাটা তা হলে বিবেচনা করে দেখুন একবার। এককালের যুদ্ধের পর যুদ্ধজয়ী অমিতবীর্য মহাপরাক্রমশালী রাজা প্রতাপরুদ্র—যাঁর ইতিহাসে পরিচয় বীরগজপতি-গৌড়েশ্বর-নবকোটি-কর্ণাটক-কলুবরিগেশ্বর-শরণাগত-জমুনাপুরাধীশ্বর হুশনসাহিসুরত্রাণ-শরণ রক্ষণ-শ্রীদুর্গাবরপুত্র-পরমপবিত্র-চরিত্র-রাজাধিরাজ পরমেশ্বর (Catalogue of sanskrit Mss, at the India office Library in London ; Ed. by Dr. Eggelling, P. 419, No. 1404) বলে, তাঁরই দুই পুত্র, এক পত্নী শত্রুকরকবলিত চৈতন্যচরণামৃত পানের অল্প কিছুদিন পরেই। রাধাভজা আপনার মহাপ্রভুর বৈপ্লবিক শক্তির দৌড়টা একবার বুঝুন এখন। এরপর আরও আছে। বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেব রায় তাঁর প্রধান মন্ত্রী আপ্পাজীর পরামর্শ অনুসারে প্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ মহাপাত্রকে গোপনে ধনরত্ন উৎকোচ দিয়ে নিজের দলে টেনে এনে, প্রতাপরুদ্রের রাজধানীতে অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, সুকৌশলে অতি আকস্মিকভাবে তাঁর রাজধানী এবং রাজপ্রাসাদ যখন অধিকার করে নিলেন, নিরুপায় প্রতাপরুদ্র কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাতে বাধ্য হলেন। সন্ধি হলও শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু সেই সন্ধির বিনিময়ে প্রতাপরুদ্রকে কি মূল্য দিতে হয়েছিল জানেন? নিজের আদরিণী কন্যা জগমোহিনীকে (নামান্তর তুক্কা) তুলে দিতে হয়েছিল শত্রু কৃষ্ণদেবের হাতে, যৌতুক হিসেবে

দিতে হয়েছিল কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত তাঁর অধিকৃত সমস্ত দেশকে (R. swell's A forgotten Empire, P. 320), তেলেগু গ্রন্থ 'রায়বাচকম্' বা বেঙ্কটরায় বিরচিত সংস্কৃত কাব্যপুস্তক 'কৃষ্ণরায়বিজয়ম্' পড়লেই অপমানকর কন্যাবলিদানের সব কথা জানতে পারবেন। জানতে পারবেন পর্তুগীজ লেখক নুনেজের (Fernaonunez) লেখা পড়লেও। তাহলে এখন দাঁড়ালটা কি? আপনার মহান বিপ্লবী পুরুষসিংহের প্রভাবছায়ায় এসে একজন সত্যিকার পুরুষসিংহ অপরাজেয় রাজা কেমন চমৎকার মুষিকে পরিণত হ'ল। পুত্র পত্নী শত্রু হস্তে বন্দী। যুবতী পুত্রীকে উপঢৌকন দিয়ে, সাম্রাজ্যের একটা বিরাট অংশ শত্রুপদতলে নৈবেদ্য দিয়ে নিজের রাজগিরি বাঁচাতে ব্যস্ত সেই চৈতন্য উপদেশমৃতপায়ী হতভাগ্য মুষিক। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্রদেব যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁর রাজ্য বঙ্গদেশের হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা থেকে আরম্ভ করে মাদ্রাজের গুণ্টুর (Guntur) জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ওদিকে তেলিঙ্গানারও অধিকাংশ ছিল তাঁরই দখলে। আর, আপনার রাধে-রাধে বলে চীৎকার করা গোপিণীগত প্রাণ সেই পুরুষসিংহের খপ্পরে পড়ার পর, প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালের শেষভাগে, সেই উৎকলরাজ্যেরই সীমানা আমরা দেখতে পাই কত ছোট হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণে গোদাবরী নদী, আর উত্তরে রূপনারায়ণ তীরবর্তী 'পিছলদা' নামক গ্রাম (Dr. S. K. Ayangar in cambridge Histoıy of India, vol III, p. 497) এই দুইএর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড ছিল মাত্র শেষ পর্যন্ত প্রতাপরুদ্রের শাসনাধীনে। নর্তন কীর্তনে মজে থাকা এক ছিঁচ্‌কাদুনে গুরুর পাল্লায় পড়ে শৌর্য-বীর্যে অতুলনীয় এক রণনিপুণ নৃপতির সব গেল। পত্নীর বন্দীত্বে মান গেল, ভূখণ্ডের পর ভূখণ্ড হারিয়ে প্রতিপত্তি গেল, কন্যাকে সন্ধির যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে ইজ্জৎ গেল। আহা, প্রতাপরুদ্রের কন্যার কথা ভাবতে

চোখে জল আসে। শাজাহান-কন্যা জাহানারার মতই তুক্কারও (জগমোহিনী) ছিল কবিত্ব প্রতিভা। শত্রু রাজার হাতে পড়ে সেই তারই কী হেনস্তা। নামেমাত্র বিয়ে করে কী হৃদয়হীন অনাদরের গ্লানিতেই না ডুবিয়েছিলেন কৃষ্ণদেব রায়—উৎকলরাজ-কন্যাকে! বেচারী সেই নিদারুণ অবহেলা সইতে না পেরে নিজেকে নিজেই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল 'কম্বম্' নামক স্থানে (Kambam in the Kuddapah District)। সেখানেই সে তার বাকী জীবনটা অতিবাহিত করেছিল চোখের জল ফেলে—একান্ত নিভৃতে সঙ্গীহীনা অবস্থায়। আর, সেই মর্মান্তিক দিনগুলির দহনজ্বালার মধ্যে বসেই প্রতাপরুদ্রতনয়া তুক্কা রচনা করেছিল তুক্কাপঞ্চকম্ নামের পদ্যসমূহ। জাহানারা তার আত্মকাহিনী লিখেছিল ফার্সিতে, আর তুক্কা পদ্য রচনা করেছিল সংস্কৃতে—পার্থক্য কেবল ঐটুকুই। না হলে উভয়ের রচনাতেই চোখের জলের নুনের ভাগ প্রায় সমানই।

আনন্দের এই সময়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেদিন রাত্রে প্রভুজীর বলা কথাগুলি। তিনি বলেছিলেন—রণক্ষেত্রে যতবারই পূর্বকার দিগ্বিজয়ী প্রতাপরুদ্রের পরাজয় ঘটতে লাগল, চৈতন্যবিরোধী গোষ্ঠী ততবারই ঐ পরাজয়ের কারণ হিসেবে জনসাধারণের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেই। রটনা করতে লাগল—রাজাকে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা করে তুলে তাঁর সমস্ত শৌর্য-বীর্য নষ্ট করে দিয়েছে কীর্তন-সর্বস্ব রাধিকাভাবের সাধক ঐ নবদ্বীপনন্দনই। প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগেকার সেই দুরভিসন্ধিমূলক রটনার প্রভাব থেকে আজও তবে মুক্তি পাই নি আমরা? আজও ঐ রকম হাজারে হাজারে শান্তিপ্রিয় সেন দেশব্যাপী শুধু দোষারোপ করেই চলেছে ভক্তিভাবের নবদিগন্তের আবিষ্কর্তা শ্রীগৌরাঙ্গেরই প্রতি প্রতাপরুদ্রের রাজ্যসীমা ক্ষুদ্রতর হওয়ার জন্য।

মাঝখানে সেনের বিক্রমে একটু ভাটা পড়লেও শেষ বক্তব্যের সময় আবার সে যে বেশ ঝাঁঝাল হয়ে উঠেছিল সেটা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারল আনন্দ।

সাহেবি পোষাক পরা ভদ্রলোককে দেখে মনে হল সেনের শেষ কথাগুলো তাঁকে যেন বেশ কিছুটা বিহ্বল করে তুলেছে! এর পর ঠিক কোন যুক্তি দিয়ে যে শুরু করা যায় এটা যেন তিনি ভেবেই পাচ্ছেন না। আনন্দ ভাবল—এইবার তাকেই বুঝি আসরে নেমে তর্কের হাল ধরতে হয়। কিন্তু না, তাকে তা করতে হল না। সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে অদ্ভুত সুললিত অথচ ভাবগম্ভীর কণ্ঠে সরব হয়ে উঠলেন সহসা, বৃদ্ধা মহিলা। বললেন—উড়িষ্যা আর বাংলার এক সীমান্ত শহরে আমার স্বামী নামজাদা অ্যাড্‌ভোকেট হলেও, উকিলের বুদ্ধি আমার মধ্যে অনুপস্থিত। তাই তর্ক আমি করতেই পারি না একেবারে। তবু কিছু কথা না বলেও পারছি না বাবা। তোমাদের মুখ্যুসুখ্যু এই মায়ির ভুলচুক তোমরাই শুদ্ধ করে নিও। এই বলে মুহূর্তের বিরতিতে মুখের মধ্যে হাতে রাখা একটা পানের খিলি গুঁজে দিয়ে পুনশ্চ আরম্ভ করলেন তিনি। বললেন—প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের প্রথম ভাগ তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। তখন বিদরের (Bidar) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাহ্‌মনী সুলতান মহম্মদ্ পরাক্রমহীন ছিলেন। বিজয় নগরের সালুব-বংশ ছিল ধ্বংসোন্মুখ। আর গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ্ তখনও যথেষ্ট প্রতাপশালী হয়ে উঠতেই পারে নি। তাই পর পর কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হওয়া স্বাভাবিক কারণেই সম্ভব হয়েছিল প্রতাপরুদ্রের। কিন্তু তাঁর চরিত্রে অন্যের রাজ্য অযথা গ্রাস করার পিপাসা কখনই ছিল না। সেই কারণেই বোধ করি নিজের রাজ্যবিস্তারের চেষ্টাও তিনি করেন নি যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়াধিপতি পাঠান সুলতান হুসেন শাহ্ অতর্কিতে আক্রমণ করে বসল

উড়িষ্যাকে। যে বছর আমাদের ঠাকুর গৌর প্রথম পদার্পণ করলেন শ্রীক্ষেত্রের মাটিতে, সেই ১৫১০ খৃষ্টাব্দেই দক্ষিণে অভ্যুদয় ঘটল বিজয়নগরের রণচতুর প্রতাপান্বিত অধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের। ওদিকে নতুন বাহ্‌মনী সুলতানও ক্রমেই হয়ে উঠল ভয়ানক রকমের দুর্ধর্ষ এবং আগ্রাসী। তিন দিক থেকে তিন প্রবল শত্রুর ক্রমান্বয় আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল প্রতাপরুদ্রদেব গজপতিকে। তাতে কিছু কিছু ক্ষয়ক্ষতি ত' তার হবেই বাবা, কিন্তু তার জন্য তোমরা আমাদের গৌরমণিকে দুষ্‌বে কেন? কোন রাজবংশ পৃথিবীর কোথাও কি কখনও একভাবে চিরদিন রাজত্ব করতে পেরেছে? যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা! কোথায় গেল শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য? কোথায় খুঁজে পাবে আজ শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব? যে কৃষ্ণদেব রায়ের এত শক্তিপ্রমত্ততা, এত দিগ্বিজয়—চেয়ে দেখ তাঁরই অধঃস্তন অচ্যুত রায়, রামরাজ প্রভৃতির সময়ে সেই বিজয়নগরের কি দুর্দশা। টালিকোটের যুদ্ধে মুসলমানরা হিন্দুদের পরাভূত করে রামরাজকে হত্যা আর বিজয়নগরকে চুরমার করল, বিজয়নগরের শত শত মর্মরসৌধ ধূলিসাৎ হল। কই বিজয়-নগরের কেউ ত' গৌরাঙ্গের চরণ চুম্বন করে নি। তবে কেন প্রতাপরুদ্রের রণক্ষেত্রে পরাজয়ের জন্য অকারণেই তোমরা আমাদের প্রাণগৌরকে দায়ী করবে? ঐতিহাসিক প্রভাত মুখুজ্জে তাঁর The history of medieval Vaishnavism in Orissa গ্রন্থে ঠিক আমার এই কথাগুলিই ইংরেজীতে লিখেছেন যেন। তিনি লিখেছেন—

The real cause of the fall of the empire was not the 'acceptance of Neo—Vaishnavism', but the weakness of the successors. It is a law of nature that no family can produce uninterrupted line of geniuses. The tottering empire, surrounded by

powerful foes, was like the bow of Ulysses which only a strong man could handle. প্রতাপরুদ্র কখনই তেমন লৌহস্নায়ুর মানুষ যে ছিলেন না তা তাঁর সময়কার উড়িষ্যার ইতিহাস পড়লেই জানতে পারা যায়। প্রভাতবাবু বলেছেন—

It is difficult to link this sickening tale of moral turpitude with the Chaitanya Movement, which taught mankind to be faithful and honest··· Thus Vaishnism or no Vaishnavism--the succession of weaklings, the moral degeneration of high officials of the state and the decline in thc military strength of the nation would have brought about the downfall, sooner or later (chap. XI pp. 177-78)।

কিন্তু মা, সারা জীবন যে মানুষটা গোপীপ্রেম, কিশোরী-প্রেম আর রাধা রাধা বলে কাটাল, তাকে ভদ্রলোক বিপ্লবী বলছেন কী হিসেবে বলুন ত'? বিপ্লবী সন্ন্যাসী বলি আমরা বিবেকানন্দকে। হ্যাঁ, পুরুষসিংহ যদি বলতে হয় ওঁকেই।

সেন এবার আক্রমণের অন্য পথ খুঁজছে বোঝা গেল।

উদার হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে শান্তা মায়ি জবাব দিলেন—সেই স্বামী বিবেকানন্দই যে গৌরহরির প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ হয়েছিলেন কতবার তা বুঝি জানা নেই?

শক্তির পূজারী বিদ্রোহী সাধু বিবেকানন্দ করেছিলেন রাধাভজা চৈতন্যের প্রশংসা? এমন মিথ্যে কথা আপনাকে কে বলেছে মা?

মিথ্যে নয় বাবা, মিথ্যে নয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজবাসীগণ যে অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন স্বামীজিকে, তারই উত্তরে আমেরিকা থেকে তিনি লিখেছিলেন—'একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই 'অবিচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক' জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়া-ছিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক

তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল, কিছুদিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্ম জীবনের সহভাগী হইয়াছিল।' বৃদ্ধা লহমার জন্যে নীরব হলেন একবার। বোধকরি কিছু স্মরণ করার প্রয়াসেই এই নীরবতা। মহাপাত্র এতক্ষণ বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে শুনছিলেন মহিলাটির কথা। শান্তা মায়ি থামতেই—মহাপাত্রের উদগ্রীব কণ্ঠ শ্রুত হল—'তারপর মায়ি, তারপর ?

বৃদ্ধা আবার আরম্ভ করলেন—আর গোপীপ্রেমের কথা যে বলছিলে একটু আগে। তা এ গোপীপ্রেম সম্বন্ধে যে বিবেকানন্দকে তুমি বিপ্লবী বলে স্বীকার করেছ, তিনি কি বলেছেন জান ?

বড় বড় চোখ করে বিকৃত স্বরে শান্তিপ্রিয় জানাল—এমন কথা ত' কোথাও পড়িনি, কারুর মুখে শুনিনি জীবনে যে, বিবেকানন্দ লিখে গেছেন গোপীপ্রেম সম্বন্ধে। তা কি লিখেছেন? নির্ঘাৎ কষে গালমন্দ করেছেন ঐ গোপীপ্রেমীদের ? পুনরায় ঠোঁটে সহজ সরল হাসি ফুটিয়ে মায়ি বললেন—শোনই না কি লিখেছেন তিনি বৃন্দাবনের গোপিনীদের প্রেমলীলা সম্বন্ধে। তিনি বলেছেন, আমি এক্ষণে এই আর্যাবর্ত নিবাসী ভগবান শ্রীচৈতন্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া এই বক্তৃতা শেষ করিব। তিনি গোপীদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন......। সেই প্রেমের অত্যদ্ভুত বিকাশ যাহা সেই বৃন্দাবনের মধুর লীলার রূপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—প্রেম মদিরা পানে যে একবার উন্মত্ত হইয়াছে সে ব্যতীত আর কেহ তাহা বুঝিতে অক্ষম।...... আমাদের সহিতই শোণিত সম্বন্ধে সম্বন্ধ অশুদ্ধাত্মা নির্বোধ অনেক আছে, যাহারা গোপী-প্রেমের নাম শুনিলে যেন উহাকে অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া দশহাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে আমি কেবল এটুকু বলিতে চাই, আপনার মনকে আগে বিশুদ্ধ কর, আর তোমাদিগকে ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে, যিনি এই অদ্ভুত গোপীপ্রেম বর্ণনা

করিয়াছেন তিনি আর কেহই নহেন, সেই আজন্মশুদ্ধ ব্যাসতনয় শুক। ……প্রথমে কাম, কাঞ্চন, নাম, যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখনই—কেবল তখনই গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এতই বিশুদ্ধ জিনিষ যে সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্তে যাদের হৃদয়ে কাম কাঞ্চন যশোলিপ্সার বুদ্বুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে, উহার সমালোচনা করিতে যায়! কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা। এমন কি দর্শনশাস্ত্র শিরোমণি গীতা পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ, গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তিসাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বর-রসাস্বাদনের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততা বিদ্যমান; এখানে গুরু-শিষ্য, শাস্ত্র উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই, সব গিয়াছে—আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছুই মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ—একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্য্যন্ত কৃষ্ণের ন্যায় দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়।…… যখন সমগ্র জগত তোমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্য কোন কামনা থাকিবে না, যখন তোমাদের সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইবে, আর কোন লক্ষ্য থাকিবে না, এমন কি তোমাদের সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা পর্য্যন্ত থাকিবে না তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের অহেতুক প্রেমের শক্তি বুঝিবে। ইহাই লক্ষ্য। যখন এই প্রেম পাইলে—তখন সব পাইলে। (ভারতে বিবেকানন্দ)।

কেবল আনন্দ নয়, দুই উত্তপ্ত তার্কিক মুগ্ধ হয়ে শুনছিল্ম সিঁদুর, অলঙ্কার আর চওড়া পাড় শাড়ীতে সজ্জিতা স্বর্ণবর্ণা বৃদ্ধার মুখের কথাগুলি। অনুত্তেজিত স্বরে কী গভীর আন্তরিকতা নিয়েই না ধীরে ধীরে নিজের বক্তব্যকে পরম প্রত্যয়ে পরিবেশন করছিলেন এতক্ষণ মায়ি।

তাঁর কথা শেষ হতেই পুনশ্চ তাঁকে প্রশ্ন করলেন মহাপাত্রই। শুধালেন, আর মায়ি, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু বলে যান নি মহাপ্রভু সম্বন্ধে?

বলেছেন বৈকি! বাংলার দুই শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিপ্লবী ঠাকুর গৌরহরি আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ, দুজনেরই প্রাণের দিগ্বিদিক-প্লাবী আধ্যাত্মিকতাকে প্রথম সজাগ করে তুলেছিল কিন্তু একই পুরী সম্প্রদায়। এটা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীই প্রথম সুপ্ত ধর্মপ্রতিভাকে জাগ্রত করে তুলেছিলেন গৌরাঙ্গদেবের মধ্যে। আর রামকৃষ্ণদেবকে সন্ন্যাসাশ্রম দান করে দুরন্তগতিতে সাধন মার্গে এগিয়ে যাওয়ার নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন তোতাপুরী। ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের এই দুই যুগস্রষ্টা দিশারীরই জন্মও হয়েছিল ঐ একই ফাল্গুন মাসেই। পরমহংসদেব অনেক জায়গায় অনেকবারই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিয়ে আলোচনা করেছেন চৈতন্যদেবের প্রেম আর ভক্তির বিষয়ে। শ্রীগৌরাঙ্গের যে প্রেম আর ভক্তিবাদকে তুমি একটু আগে বিদ্রূপ করছিলে সেন বাবা, বিদ্রূপ করেছেন রাখালদাস বাঁড়ুজ্জে আর হরেকৃষ্ণ মহতাবের মত কত না ঐতিহাসিক। (History of Orissa, vol. I, by R. D. Banerjee, pp. 330-31. History of Orissa, vol. I. by H. K. Mahtab, p. 329).

এই হতভাগ্য দেশের, সেই ভক্তিবাদ সম্বন্ধেই বলতে গিয়ে ভাবাবেশে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিবারই। তিনি বলেছেন—চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান জ্ঞানসূর্যের আলো।

আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম দুই-ই ছিল।। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, ৯ম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

আপনি যা যা বলছেন আমি কিন্তু তার একটি বাক্যও বিশ্বাস করছি না মা। কালীসাধক, আমিষাশী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ত' আর অন্য কোন কর্ম ছিল না—তাঁরা গেছেন আকাট বোষ্টম শাক-পাতা খাওয়া দু' হাত তুলে হরি হরি বলে তড়াক্ তড়াক্ নৃত্য করা ঐ চৈতন্যের সুখ্যাতি করতে। শান্তিপ্রিয়র কণ্ঠে শান্তিহীনের অভব্য প্রগল্‌ভতা।

কিন্তু তাতে মায়ির হাসিবিচ্ছুরিত চোখমুখের ঔজ্জ্বল্য স্তিমিত হল না একটুও। তিনি সহাস্যেই পুনর্বার বললেন—বেশ ত' বিশ্বাস করতে না ইচ্ছে হয়—নাই বা বিশ্বাস করলে। কিন্তু তবু শুনে রাখতে দোষ কি? শোনই না পরমহংসদেব আরও কি কি বলেছিলেন চৈতন্যের প্রেমভক্তি সম্বন্ধে। বলেছিলেন, কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ করবে কোন সন্দেহ নাই।...... (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম ভাগ, ৪র্থ খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

চৈতন্যদেব ভক্তির অবতার, জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন (শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, ১১শ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)। সত্যিকার ভক্তির ওপর ভিত্তি যে ধর্মের, সেই ধর্ম কি কখনও কোন জাতি বা দেশের ক্ষতি করতে পারে? অথচ উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত 'নব কলেবর-স্মরণী ও উড়িষ্যা-পরিচিতি' (১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা সরকারের পাবলিক রিলেসন্‌স্ ডিপার্টমেণ্ট কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, পৃষ্ঠা—২৭) নামক পুস্তিকাতে যা লেখা হয়েছে তার মূল বক্তব্য কিন্তু হচ্ছে—রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব সর্বযুগে সর্বদেশেই সর্বনাশের কারণ হয়েছে। কিন্তু, সত্যিই কি

তা হয়েছে বাবা? অতীতের ইতিহাস কি আমাদের সেই কথা বলে? ধর্ম মানে ত' ধর্মান্ধতা বা ধর্মোন্মত্ততা (Fanaticism) নয়! ধর্মোন্মত্ততা পাশবিকতারই আর এক নাম। তার প্রভাবে রাজনীতি নিশ্চয়ই কলুষিত হবে, ডেকে আনবে দেশ ও দশের চরম বিপর্য্যয়। কিন্তু ভক্তি ভিত্তিক ধর্ম যে সব জীবের মধ্যেই শিব দেখতে পায়! তার প্রভাবে রাজনীতিও তখন পরম শুভঙ্করই হয়ে ওঠে। রামচন্দ্রের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব ছিল ষোল আনা, তাতে কোশলের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হয়েছিল কি? শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিও ছিল ধর্মভাবপরিচালিত—তাতেও দেশ আর সমাজ উপকৃতই ত' হয়েছিল। অশোক ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁর রাজ্য-পরিচালনার প্রতিটি পদক্ষেপেই তাই আমরা দেখতে পাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন প্রকৃত ধার্মিক, তাই নিজে বৌদ্ধ হয়েও তাঁর শিলালিপিতে তিনি অনায়াসে ঘোষণা করতে পারলেন—তোমার সঙ্গে যার ধর্মমত এক নয় এমন গৃহী অথবা সন্ন্যাসী যে কোন ব্যক্তির ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কোরো। (শরৎকুমার রায়, বিদ্যারত্ন, বিদ্যাভূষণ রচিত বৌদ্ধ ভারত, পৃঃ ৭৮)।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর কলিঙ্গাধিপতি খরবেল (Kharabela) ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জৈন নৃপতি। একদিকে পূর্বঘাট থেকে পশ্চিমঘাট পর্য্যন্ত, অপরধারে—দক্ষিণের কৃষ্ণাতীরবর্তী পাণ্ড্যরাজ্য থেকে উত্তরে মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ড ছিল তাঁর পদানত। ভুবনেশ্বরের অদূরে অবস্থিত উদয়গিরি-খণ্ডগিরি অনুপম শিল্প কর্মও যে খরবেলেরই অমরকীর্তি—সেই খরবেলও ত' স্বয়ং অত্যন্ত গোঁড়া জৈনধর্মী হয়েও নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতে পেরেছিলেন—আমি সর্বধর্মের পূজারী, আমি সমস্ত ধর্মের মন্দিরের সংস্কারক (Dr. K. S. Behera লিখিত Glimpses of the past: sidelights on the cultural heritage of Orissa প্রবন্ধ

দ্রষ্টব্য। Indian History congress 1977 souvenir-এ প্রকাশিত। পৃঃ 41)।

ভৌম-বংশীয় (Bhaumakara Dynasty) রাজা শুভকর দেবকেও আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই ব্রাহ্মণদের মস্ত পৃষ্ঠপোষক রূপেই, বৌদ্ধ হয়েও তাঁকে বর্ণাশ্রম প্রথা কঠোর ভাবে মেনে চলতে। এঁদের সকলের রাজনীতিতেই ত' ছিল ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব, কিন্তু কই, এঁদের কারুর রাজত্বকালই ত' অত্যাচার-অনাচার আর দুর্নীতিতে কলুষিত হয় নি, পতনও হয় নি এঁদের কারুর রাজ্যেরই। বরং শিল্পে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, বাণিজ্যে এঁদের সময়েই রাজ্যগুলি শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জনে সক্ষম হয়েছিল সারা ভারতে। তার কারণ এঁরা ছিলেন প্রকৃতই ধর্মের পূজারী, যে ধর্ম মানবতাবিরোধী নয়, যে ধর্ম স্বার্থসর্বস্ব নয়, যে ধর্ম নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে ধর্মোন্মত্ততাকে ধর্মের নামে প্রশ্রয় দেয় না কখনও। তাই বলছিলাম—নবকলেবর স্মরণী ও উড়িষ্যা পরিচিতি পুস্তিকাতে উড়িষ্যা সরকার ঠিক কথা লেখেন নি। আর যে ঐতিহাসিকবৃন্দ প্রতাপরুদ্রদেবের সময়ে উৎকল রাজ্যের প্রতাপ ক্রমশঃ কমে আসার জন্যে চৈতন্য-প্রচারিত ধর্মকেই দায়ী করে পরম তৃপ্তি লাভ করে থাকেন তাঁরাও আসলে ভুলই করেন। ঐ ঐতিহাসিকরা কি জানেন না যে, চৈতন্যের পরবর্তীকালে চৈতন্যভাবপুষ্ট হয়েই হিন্দু সমাজে কেমনভাবে এক বিরাট ক্ষাত্র শক্তির উদ্বোধন হয়েছিল। বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে মল্লভূমে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্প-সঙ্গীত-চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্য ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রভূমি বিষ্ণুপুরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই সেই কীর্তিউজ্জ্বল ক্ষাত্রশক্তির সন্ধান মিলতে দেরী হবে না। আবার অন্যদিকে পূর্বপ্রান্তে আসামের পর্বতমালার অভ্যন্তরে অনার্য নাগাজাতির সংমিশ্রণে প্রতিষ্ঠিত

মণিপুর রাজ্য ও মণিপুরী জাতির শিক্ষা সভ্যতার ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় মণিপুরের ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপরে আমাদের গৌরহরির প্রভাব এখনও কত গভীর। ঠিক এমনই গারো, টিপারা, খাসিয়া প্রভৃতি আরও কত পার্বত্য জাতির ওপরেই যে চৈতন্য প্রভাব আজও অক্ষুণ্ণ, অটুটই রয়ে গেছে তার সন্ধান রাখেন কি চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের নিন্দাকারী ঐ ঐতিহাসিকের দল?

বৃদ্ধা মহিলা হাসলেন। কথার শেষের দিকটায় একটা চাপা ক্ষোভে তাঁর কণ্ঠ বার বার কেঁপে উঠছিল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি তাঁর বাক রুদ্ধ হয়ে যাবে।

মহাপাত্র ছুটে গিয়ে প্রথমে হাত চেপে ধরলেন পুত্তলিবৎ দাঁড়িয়ে থাকা শান্তিপ্রিয় সেনের। বললেন—ভাই, ভাগ্যে আপনি আমার মহাপ্রভুর উপর অন্যায় কটাক্ষপাত করে আমায় ক্ষেপিয়ে তুললেন, তবেই না মায়ি আজ মুখ খুললেন। না হলে কেমন করে সন্ধান পেতাম আমরা মায়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডারের। তারপর শান্তাদেবীর চরণ স্পর্শ করে পদধূলি গ্রহণান্তে শ্রদ্ধাসিক্তস্বরে নিবেদন জানালেন—এইবার এই অধমের প্রতি অনুগ্রহ করুন মা। দয়া করে বলে দিন আমাকে, কোথায় রয়েছে আমাদের সেই প্রাণের প্রভুর সমাধি? পুলিশে কাজ করতাম, পাপের পাহাড় জমেছে সারা জীবন ভরে। তাই আপনি যেদিন বললেন, চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান রহস্যের অতি গোপন কথা শুনাবেন আপনি, দেখাবেন তাঁর সমাধি স্থান, সেদিন থেকে একটা নতুন আশার 'আলো দেখতে পেয়েছি—হৃদয়ে। বার বার মনে হচ্ছে যেখানে শুয়ে আছেন সেই পতিত পাবন—সেখানকার সন্ধান যদি পাই, যদি পারি সেই লক্ষ পাপীতাপীতারণের সমাধিমূলে একবার কপাল ঠেকাতে, হয়ত কিছুটা লাঘব হবে পাপের বোঝা আমার। আমার পাপের তাপে ঝলসে যাওয়া বুকের এই নতুন

আশার আলোটুকু নিভিয়ে দেবেন না মায়ি, আমায় দয়া করুন, করুণা করুন এই অভাগার প্রতি—! বলতে বলতে দুই হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন তিনি বৃদ্ধামহিলার পদপ্রান্তে।

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি মহাপাত্রের দু কাঁধ ধরে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে প্রগাঢ় স্নেহের সুরে থেমে থেমে কথা কইলেন –'ছিঃ অমন করে বলতে হয় না, বাবা। আমিই যে সকলের করুণার ভিখারী, আমি আবার করুণা করব কাকে? যে কথা আমি দিয়েছি তোমাকে আর ঐ সেন বাবাকে, সেকথা রাখবার জন্যই ত' আজ এখানে আমার আসা। কোথায় কেমনভাবে চিরদিনের মত লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন মহাপ্রভু তা নিশ্চয়ই শোনাব তোমাদের দু'জনকেই, নিশ্চয়ই নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেব তোমাদের আমার গৌরসুন্দরের সমাধি—যদি রাজি থাক তোমরা আমার সঙ্গে যেতে।'

মহাপাত্র এবং সেন একই সঙ্গে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—'আমরা এখনই রাজী মায়ি!'

শান্তাদেবী বলে চললেন—"তোমাদের দুজনের বিতর্ক শুনে বুঝতে পেরেছি গৌরকে তোমরা কত ভালবাস। আর ভালবাস বলেই না এমন বিশদভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাঠ করেছ তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলি।"

সবিস্ময়ে আনন্দ লক্ষ্য করল বৃদ্ধার এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপ্রিয়র দুই নয়নে অশ্রু উথলে উঠল যেন। বাষ্প-রুদ্ধস্বরে সেন বলতে চাইল—'কিন্তু, মা, আমি ত' আজ কেবল তার নিন্দাই করেছি, তবু আপনি কেমন করে বুঝলেন—' কথা তার অসমাপ্তই রয়ে গেল। মায়ি বলেই চললেন—'যাঁর কণামাত্র কৃপা লাভ করেই দবির খাস (পরবর্তীকালে যিনি শ্রীরূপ, দবীর=সচিব, খাস=নিজস্ব) আর সাকর মল্লিক (সাকর=শ্রেষ্ঠ,

(মল্লিক = গৌরবের পাত্র) শ্রীসনাতন গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদও ছেড়ে দিল হাসতে হাসতে (চৈঃ চঃ, মঃ ১৯।১৩-২৩), রায় রামানন্দ ছেড়ে দিল রাজমহেন্দ্রীর রাজ্যপালের পদ, সপ্তগ্রামের ধনকুবের জমিদারের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করল তার ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য আর অপ্সরাসম ভার্যা যাঁর প্রেমের স্পর্শটুকুমাত্র পেয়েই শক্তিমদেমত্ত মদ্যপ ভ্রষ্টাচারী নবদ্বীপের দোর্দণ্ডবিক্রম নগর কোটাল জগন্নাথ আর মাধবদাসও (জগাই মাধাই) অম্লানবদনে প্রতিদিন প্রাতে সকলের আগে গঙ্গায় গিয়ে গঙ্গারঘাট স্বহস্তে ধুয়ে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে রাখতে আরম্ভ করে দিল যাতে লোকে একটু আরামে বসে স্নানাহ্নিক করতে পারে (এখনও নবদ্বীপের একটি ঘাটের নাম 'মাধাই-এর ঘাট')। সেই আমাদের প্রেমের ঠাকুরের দয়া থেকে তুমিই বা কেন বঞ্চিত হবে মহাপাত্র বাবা ? এই পর্য্যন্ত বলে, একবার নীরব হলেন সালঙ্কারা বৃদ্ধা। কী সব যেন ভাবলেন আপন মনে কিছুক্ষণ। তারপর আবার শুরু করলেন ধীরে ধীরে, 'এইবার তোমরা দুজনেই স্থির হয়ে বস বাবা মনটাকে একটু শান্ত করে নাও। কারণ, এবার তোমাদের শুনতে হবে এমন এক অন্তর্দ্ধানের কাহিনী যে কাহিনী নেতাজী সুভাষের উধাও হয়ে যাওয়ার কাহিনীর চেয়ে একটুও কম রহস্যময় নয়।'

মহাপাত্র এবং সেন আকুল আগ্রহ ভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল মায়ির মুখের পানে নির্বাক হয়ে। আনন্দেরও সমস্ত প্রাণমন উৎকর্ণ হয়ে উঠল মুহূর্তে—এক দুঃসহ উত্তেজনায়। চৈতন্যের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে কী এমন কথা জানা থাকতে পারে ঐ মহিলাটির যা নাকি নেতাজীর উধাও হওয়ার চেয়ে একটুও কম রহস্যময় নয়। এর ওপর উনি নাকি আবার কথাও দিয়েছেন মহাপাত্র এবং শান্তিপ্রিয়কে—ওদের উনি দেখিয়ে দেবেন সেই সমাধিটি, যে

সমাধির খোঁজে পাগলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে আনন্দ; প্রভুজী রাজমহেন্দ্রী রওনা হবার পরের দিন থেকেই।

অত্যন্ত নিম্ন অথচ গাঢ় স্বরে কথা শুরু করলেন এবার শান্তা মায়ি। যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছেন তিনি। বলতে লাগলেন, শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট লীলা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তোটা গোপীনাথের মন্দিরকে টেনে এনেছেন অনেকেই, সেটা আশা করি লক্ষ্য করেছ তোমরা। জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে লিখলেন -

চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥

(উত্তর খণ্ড, পৃঃ ১৫০)

বৈষ্ণবচরণ দাস লিখলেন—

কানাই খুঁটিয়া শিখি মাহান্তি আবর।
ঘেনিলে অঙ্গকু তোটা গোপীনাথ পুর॥

(চৈতন্যচকড়া)

আবার ভক্তিরত্নাকরে ঘনশ্যামদাসও বলেছেন চৈতন্যদেব অপ্রকট হবার সামান্য কিছুদিন আগে আচার্য নরোত্তম মহাপ্রভুকে দর্শন করবার আশায় পুরী যাত্রা করেন, কিন্তু তিনি নীলাচলে পৌঁছবার পূর্বেই শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রকট হন। আশাহত নরোত্তম শোকার্ত হৃদয়ে গদাধরের কুটীরে হাজির হলে গদাধর পণ্ডিতের সেবক কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে চৈতন্য-সমাধি দেখিয়ে বললেন—

ওহে নরোত্তম এইখানে গৌরহরি।
না জানি কি পণ্ডিতে কহিলা ধীরি ধীরি॥

এদিকে চৈতন্য সম্প্রদায়ীদের মধ্যেও একটি প্রবাদের খুব প্রচলন দেখা যায়। তাঁদের অনেককেই বলতে শোনা যায়—

কি করিব কোথায় যাব বচন না সরে।
গোরাচাঁদে হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে॥

এ সবগুলি এক জায়গায় নিয়ে বিচার করলে যে কারুরই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, গৌরাঙ্গদেবের শেষলীলার সঙ্গে কোন না কোন রকম ভাবে তোটা গোপীনাথের সম্পর্ক নিশ্চয়ই কিছু ছিল। আমি যে সম্প্রদায়ের মানুষ সে সম্প্রদায়েরও প্রত্যেকে ঐ একটি কথাই বিশ্বাস করে। শ্রীচৈতন্য হারিয়ে গিয়েছিলেন একদিন তোটা গোপীনাথের মন্দিরেরই কোন এক প্রান্তে।

আপনার কোন্ সম্প্রদায়, মায়ি? জিজ্ঞাসা করলেন মহাপাত্র।

আমাদের সম্প্রদায়কে সকলে কর্তাভজা-সম্প্রদায় বলেই ডাকে। জবাব দিলেন মায়ি। কর্তাভজা? এ-আবার কেমন নাম সম্প্রদায়ের? এমন নাম তা শুনি নি কখনও। মায়ি একটু হাসলেন। বললেন—না শুনলেও এ সম্প্রদায় আজও বেঁচে আছে, কেবল এটুকুই জেনে রাখ। কর্তা মানে ঈশ্বর। তাঁরই ভজনা করে যারা তাদেরকেই কর্তাভজা বলা হয়। অবশ্য একেশ্বরবাদীরাই কেবল কর্তাভজা হতে পারে। এ সম্প্রদায়ের নাম না শুনলেও সতী মার কথা নিশ্চয়ই শুনেছ। সেই যে গো সতীমার মেলা বসে না প্রতি বছর? চাকদহের কাছে জগদীশপুর ছিল সতী-মা'র পতিগৃহ, স্বামীর নাম ছিল রামশরণ পাল। সতীমার আসল নাম ছিল কিন্তু সরস্বতী, মারা যাওয়ার পর তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ডাকত সবাই সতী-মা বলে। কিন্তু সে সব কথা পরে বলছি আমি। আগে শোন তোটাগোপীনাথে মহাপ্রভু আমাদের হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন কেমন করে। আসলে কি হয়েছিল তাঁর, কোথায় গেলেনই বা তিনি।

আনন্দের মনে হল—ধৈর্য্যের বাঁধ তার এবার বুঝি ভেঙ্গে যাবে।

কিন্তু ঠিক এই সময় বড় দেউল অভ্যন্তরে গর্জন করে উঠল সন্ধ্যারতির হুলুধ্বনি প্রচণ্ড নিনাদ তুলে। জ্বলে উঠল শত শত ঘৃত প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠের সান্ধ্য গগন পবন শিহরিত করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল সহস্র কণ্ঠের সেই হুলুধ্বনি আর 'হরি হরি' বল—রব।

পলকের মধ্যে শান্তা মায়ির চোখ-মুখের ভাবই গেল বদলে।

অবিশ্বাস্য এক আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর নয়ন-দৃষ্টি। স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় কি সব যেন বলতে লাগলেন তিনি বিড় বিড় করে। যেন আর বসে-থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে শুধাল—'তারপর ? তারপর বলুন মা, চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের কথা—'

কিন্তু যাঁর উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন তিনি তখন আপন মনে বলে চলেছেন আমার কর্তার কাছে যাব এবার, আমার কর্তার কাছে যাব। শুনছ না ? হুলুধ্বনি আর হরি বল রবের মধ্য দিয়ে তার ডাক শুনতে পাচ্ছ না ? সে যে এই সময় রোজ ডাকে আমায়, বার বার ডাকে। আমার যেতে দেরী হলে ঐ রত্নবেদীর ওপরে মুখ ভার করে বসে থাকবে সে। আমি যাই, আমি যাই ঐ নাট-মন্দিরে বলতে বলতে সত্যিই বৃদ্ধা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন সিঁড়ির পথ ধরে।

মহাপাত্রের কণ্ঠ এবার অনেকটা যেন হাহাকারের মত শোনাল। তিনি প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—'বলবেন না মায়ি, বলবেন না আমাকে আর দয়াল গৌরের কথা ? আমি যে বড় আশা নিয়ে আজ এসেছিলাম মাগো !'

অভিসারিকার পুলক জেগেছে বুঝি এখন ধবলাংগী বৃদ্ধার অঙ্গের প্রতি রোমকূপে রোমকূপে, তাই চপল হয়ে উঠছে ক্রমেই তাঁর চরণক্ষেপ, চটুল হয়ে উঠছে তাঁর চোখের ভাষা। ভাবোচ্ছাসিত সুরে উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে বলতে শোনা গেল—'ঐ, ঐখানে - ঐ গড়ুর স্তম্ভের পাশে, ঠিক এই সময় আমার গৌর গুণমণি ব্যাকুল কণ্ঠে জগন্নাথদেবকে ডেকে উঠতেন—মণিমা মণিমা বলে (মণিমা—সর্বেশ্বর। উড়িষ্যাবাসীরা মহারাজা এবং জগন্নাথদেবকে এই বিশেষণে বিশেষিত করতে অভ্যস্ত) স্বরূপ দামোদর গাইতেন ওড়িয়া পদ—

জগমোহন পরিমুণ্ডা যাই।
মন মাতিলারে চকা চন্দ্রকু চাহিঁ॥

আর সেই গানের তালে তালে আনন্দোল্লাসে উন্মত্ত হয়ে আজানুলম্বিত দুই বাহু তুলে নৃত্য করতেন আমাদের নবদ্বীপের গোরা রায় ঐ, ঐখানটায়—গ্যাখ গ্যাখ—ঠিক ঐখানটায়·····'

বৃদ্ধা সবেগে চলে গেলেন পেছনে পড়ে থাকা তিন জোড়া ব্যাকুল বিস্মিত চক্ষের দৃষ্টির বাইরে। মহাপাত্র তাঁর গমন পথের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। শেষে শোনা গেল তিনি অস্ফুটস্বরে নিজের মনেই বলছেন—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

॥ সাত ॥

সমস্ত রাত্রি নিদ্রাহীন কেটে গেল আনন্দের। তন্দ্রা পলাতকা। যতবার দুই চোখের পাতা এক করার চেষ্টা করল সে, বৃদ্ধার সেই সুগৌর লাবণ্যময় মুখের উজ্জ্বল হাসি ততবারই নেত্রপটে প্রতিফলিত হয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিল তার ঘুমাচ্ছন্নতাকে। বৃদ্ধা তবে জানেন সেই সমাধিক্ষেত্রের সন্ধান—? জানেন তিনি মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান রহস্যের পেছনকার অনেক গোপন কথা? কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তাঁকে? আবার কি তিনি আসবেন আজ বড় দেউলের পশ্চিমদ্বারে ঐ ধবলেশ্বর মন্দির পার্শ্বে? যদি না আসেন তাহলে—? বৃদ্ধা যে লঘু মনোবৃত্তির কোন বাতুলা নারী নন, নন যে তিনি প্রলাপী কোন বিকৃত মস্তিষ্কাও, তাত বোঝাই গেছে তাঁর যুক্তিপূর্ণ ইতিহাস ব্যাখ্যার নিপুণতা দেখেই। তাই শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে তিনি যা কিছুই বলতে চেয়েছিলেন তা যে লোক ঠকানো কোন গালগল্প কখনই নয়. সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ কোথায়?

এইরকম নানা ভাবনায় জর্জরিত হয়ে বিনিদ্র অবস্থায় যামিনী যাপনের পর ভোর যখন হয় হয় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল আনন্দ কেমন যেন একপ্রকার বিপর্যস্ত মন নিয়েই। আশ্রম থেকে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সে স্বর্গদ্বার মহাশ্মশানের সেই কোণে যেখানটায় দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাঠাকুরের অনুচ্চ সমাধিমন্দিরটি অকৃতজ্ঞ মানুষের ইচ্ছাকৃত অযত্ন এবং অবহেলায় প্রায় বালুকাবৃত হয়ে আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। যার নাম আর সাধনার মূলধনে

ধনী হয়ে বিরাট অর্থ-পর্বতের চূড়ায় বসে আজ স্বপ্ন দেখছেন আত্মাপীঠের পরিচালকবর্গ আত্মাপীঠকে দ্বিতীয় 'দয়াল বাগ' বানাবার, হায়, তাঁরই স্মৃতিসৌধের একি মর্মান্তিক দুরবস্থা।

এই অবজ্ঞাত অবহেলিত ক্ষুদ্রাবয়ব চিতা-স্তম্ভটির পাশে আনন্দ প্রায় রোজই একবার এসে বসে নিঃশব্দে, অপরাধীর মত। আজও, আকাশ ভালভাবে ফর্সা হওয়ার আগেই সেই যে এসে সে বসেছিল অন্নদাস্মৃতিসৌধের অদূরস্থ বালির ঢিবিটির ওপরে—খেয়ালই ছিল না তার অন্যদিকে, কতটা সময় যে কেটে গেছে বুঝতেও পারে নি সে। হঠাৎ কানে এসে পৌঁছোল—ঐ সমাধির তিন হাত উঁচু কক্ষটির ভেতর থেকে কোন রমণীর কঙ্কন কিঙ্কিণী। সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠল আবার তার সমস্ত অনুভূতি। ভালভাবে চেয়ে দেখল সমাধি মন্দিরের অতিক্ষুদ্র কাঠের দরজা দুটো সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। আর তারই ভেতরে গুণ্ গুণ্ করে সুমিষ্ট স্বরে কে যেন দোহা গাইছে—

তুলসী ঐসা ধেয়ান ধর।
জৈসী ব্যান কী গাঈ॥
মুহমে তৃণ চানা টুটে।
চেৎ রক্‌খে বছাই॥

(সদ্য বিয়ানো গাই যেমন মুখে তৃণ ছোলা ভক্ষণ করলেও, চিত্ত তার পড়ে থাকে বাছুরেরই ওপরে, ঠিক তেমনি, হে তুলসী, তুমিও কাজ করে যাও সংসারে কিন্তু মন ফেলে রাখো শ্রীভগবানেরই শ্রীচরণে)। কার গলার এই অপূর্ব গান? অমন ছোট্ট দরজা দিয়ে হামাগুড়ি ছাড়া ঢোকার ত' কোন উপায়ই নেই। নারী হয়েও শ্মশানভূমির ঐ কুঠুরীতে এই নির্জন প্রত্যূষে একা প্রবেশ করার সাহসই বা পেল কোত্থেকে ঐ দোহা গায়িকা? উঁকি দিয়ে একবার সমাধিকক্ষটা দেখবে কিনা যখন ভাবছে আনন্দ,

সত্যি সত্যি হামাগুড়ি দিয়েই বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে জনৈকা মহিলা। কিন্তু তাঁকে দেখে আনন্দ একেবারে স্তম্ভিত, হতবাক! যাঁর কথা ভেবেছে সে সমস্ত রজনী, যাঁর প্রাণোচ্ছল হাস্যোদ্দীপ্ত মুখচ্ছবি বার বার তন্দ্রা ভেঙ্গে দিয়েছে গত রাতে তার মন সরোবরে ছায়াপাত করে, ইনি যে সেই আনন্দের পরম প্রার্থিতা শান্তা মায়ি! কিন্তু ঐ সমাধির অভ্যন্তরে ঢুকে কী করছিলেন তিনি এতক্ষণ?

আনন্দ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পদস্পর্শ করে তাঁকে প্রণাম জানালে, আনন্দের চিবুকে হাত দিয়ে স্নেহসিক্তস্বরে শুধালেন— এখানে এখন কি মনে করে, মাণিক? যেন কতকালের চেনা—জানা।

আজ্ঞে, এম্‌নি ঘুরতে ঘুরতে এদিকে চলে এসেছি।

মায়ি সস্নেহে আবার আনন্দের মাথায় আল্‌গোছে হাত বুলিয়ে মৃদুহাস্যে জানালেন যে প্রত্যূষের এই সময়টায় আনন্দ যেন আর কখনও না আসে এদিকে। এলে তাঁর সেবার কাজে একাগ্রতা নষ্ট হতে পারে।

'কার সেবা, মায়ি?'

আমার কর্তার সেবকের সেবা গো। আমার কর্তা ওই যাকে, তোমরা বল জগবন্ধু, তাকে যে ভারী ভক্তি করত আর ভাল-বাসত অন্নদা ঠাকুর। সেবাও করত মনে মনে খুব, তাইত আমার কর্তা তাকে স্থায়ীভাবে আশ্রয় দিল নিজের খাস্ জমিদারী এই নীলাচলের বুকে। আমি যখন পুরীতে থাকি সুযোগ পেলেই এই সময়টায় এখানে এসে ঐ ঘরের ভেতরটা একটু পরিষ্কার করে দিই, দুটো ধূপ জ্বালাই। তা তুমি কে বাবা? কোথায় থাকা হয়? আনন্দ নিজের নাম বলল, বল্‌ল যে আশ্রমে থাকে সেই আশ্রমের নামও। আশ্রমের নাম শুনেই মহিলা বললেন ঐ আশ্রমেই ত' বেশ কয়েক বছর আগে

আমারই বয়সী এক মহিলা থাকতেন। নাম ছিল পংকজিনী। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি কিন্তু বল্‌তেন তাঁর নাম—কাঙালিনী, দুখিনী, অভাগিনী, পাগলিনী পঙ্কজিনী। তিনি ছিলেন শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মার খুবই নিকট আত্মীয়া। এমন ভক্তিমতী মেয়ে জীবনে খুব কমই দেখেছি! মন্দিরে গিয়ে ষড়ভূজ গৌরাংগের সামনে বসে রোজ বিকেলে একাই কাঁদতেন আর মিনতি জানাতেন—একটি-বার তাঁকে দর্শন দিতে। তা, হ্যাঁ বাবা, সেই পঙ্কজিনী এখন কোথায়? অনেক বছর হয়ে গেল, তাঁকে আর ত' দেখতে পাই নে!

'তিনি দেহ ত্যাগ করেছেন।'

'না না না, অমন করে বল না তাঁর সম্বন্ধে। বল, চৈতন্যচরণে আশ্রয় পেয়েছেন। চৈতন্যের জন্যে যে অমনভাবে কাঁদতে পারে, সে যে চির-আয়ুষ্মতী, গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে বিলীন হয়ে সে যে চির-অমরত্ব লাভ করে।' বল্‌তে বল্‌তে বৃদ্ধার দুই আঁখি অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠল।

একটু ইতস্ততঃ করে আনন্দ অনুরোধ জ্ঞাপন করল স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা মায়িকে কিছুক্ষণের জন্যে ঐ বালির ঢিবিটার পাশে বসতে। তার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে তাঁর কাছে। চোখের জল বস্ত্রাঞ্চলে মুছে ফেলে, বিনা প্রতিবাদে আসন গ্রহণ করলেন মহিলা শ্মশান ভূমির বালুকারাশির ওপরে। তারপর মৃদু হেসে শুধালেন— 'আমায় আবার কী জিজ্ঞেস করবে? কিই বা জানি আমি?'

চকিতে হাতঘড়িতে একবার চোখ বুলিয়ে নিল আনন্দ। সাড়ে পাঁচটাও হয়নি এখনও। তারপর কিছুমাত্র ভূমিকা না করেই সোজা প্রশ্ন করে বসল সে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের কথা কী জানেন আপনি? সত্যিই কি তাঁর সমাধি আপনি

নিজে চোখে দেখেছেন? যদি দেখেও থাকেন, তবু, সে সমাধি যে চৈতন্যেরই তার প্রমাণ কি কিছু পেয়েছেন কোথাও?

হয়ত ঠিক এমন ধরণের প্রশ্ন এক সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছ থেকে প্রথম দেখার মুহূর্তেই প্রত্যাশা করতে পারেন নি শান্তা মায়ি। তাই, প্রশ্ন শুনেই প্রথমে কিছুক্ষণ বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে নিরুত্তর তাকিয়ে রইলেন প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে। তারপর নিজেকে বোধহয় কিছুটা প্রস্তুত করে নিয়েই পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন তিনি—'কেন এই প্রশ্ন তোমার?' সবিনয়ে আনন্দ জানাল যে মহাপ্রভুর দেহাবসান সম্বন্ধে যতগুলি কিম্বদন্তী ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণব কবিদের গ্রন্থাবলীতে এবং নানা মানুষের মুখে মুখে সেগুলির মধ্য থেকে আসল ঘটনাটিকে ছেঁকে বেছে নেবার চেষ্টাতেই এ যাত্রায় তার শ্রীক্ষেত্রে আসা। যদি মায়ির এ ব্যাপারে সত্যিই নতুন কিছু জানা থাকে, দয়া করে তাকে জানালে, আনন্দের অনুসন্ধানের কাজের বিশেষ সুবিধা হবে।

কিন্তু কতটুকু এরই মধ্যে তুমি জানতে পেরেছ তা ত' আমার জানা নেই।

পুরীতে আসার পর গৌরাঙ্গদেবের আকস্মিক নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে যেখানে যা যা পড়েছে সে, যার যার মুখে যা যা কথা শুনেছে সে, সমস্তই ঝড়ের বেগে শুনিয়ে গেল আনন্দ একের পর এক। বৈষ্ণব-সাহিত্যে যা সে পড়েছে তা ত' শোনলই এর সঙ্গে। ডঃ নীহার রায় এবং প্রভুজীর তথ্য-ভিত্তিক ধারণার কথা, বিমান মজুমদার এবং দীনেশ সেনের বক্তব্যের কথাও খুলে বলল সে সংক্ষেপে। তারপর জানাল পুরীর প্রখ্যাত গবেষক শ্রীসদাশিব রথশর্মাজীর স্থির বিশ্বাস—চৈতন্যদেবের দেহাবসান আষাঢ়ের পূর্ণিমাতেই হয়েছিল। তার একটি প্রমাণ হিসেবে তিনি বলছেন—জগন্নাথ মন্দিরের ভিতর—ছোঁ-মহাপাত্র জগন্নাথের অঙ্গীকার সেবক। তাঁর গৃহে পুরুষপরম্পরায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আত্মনিক বিগ্রহ

পূজিত হয়ে আসছে কয়েক শ' বছর ধরে। প্রতি বছর ঐ বিগ্রহের স্বতন্ত্র সংস্কার, মার্জনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ঠিক ঐ আষাঢ় পূর্ণিমা তিথিতেই। এর থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে, চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান নিশ্চয়ই গুরু-পূর্ণিমাতেই ঘটেছিল। এর পর আরও জানাল পুরীর ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের বর্তমান কর্মসচিব স্বামী অভিনবানন্দজী একটি পত্র দিয়ে কিছুদিন আগে তাকে জানিয়েছেন যে, তাঁর সুনিশ্চিত ধারণা মহাপ্রভুর দেহটিকে মণিকোঠায় রত্নবেদীর নিম্নেই সমাহিত করা হয়েছিল। তিনি আরও লিখেছেন—এমন ধারণা কেবল তাঁর একার নয়, এখানকার স্থানীয় অনেকেরই নাকি অমনটিই বিশ্বাস। স্থানীয় আর এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, যিনি নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, তাঁর সিদ্ধান্ত কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকমের। সত্তরের ওপর তাঁর বয়স, এককালের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন স্বাধীনতাসংগ্রামী, আজও যিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসেবে সরকারী পেনসন পেয়ে থাকেন প্রতি মাসে। তিনি একদিন নিভৃতে ডেকে আনন্দকে এক অদ্ভুত কথা শুনিয়েছিলেন। সেই নির্ভীক স্বভাবের চিকিৎসক বলেছিলেন—নবকলেবরের সময় মন্দিরের উত্তরদ্বারের বহির্বেড়ে অবস্থিত শ্মশানভূমিতে (কৈবল্য—বৈকুণ্ঠ) যখন পূর্ববর্তী বিগ্রহগুলির শ্রীঅঙ্গ প্রোথিত করা হয়, তখন কিছুদূর পর্যন্ত মাটী খোঁড়ার পর একটি বিশেষ স্তরে পৌছানর সঙ্গে সঙ্গে আর মাটি খুঁড়তে দেওয়া হয় না নাকি কিছুতেই। এই রকমই নাকি মন্দির কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। ডাক্তারবাবু এবং আরো কিছু পুরীর স্থানীয় বাসিন্দার বদ্ধমূল ধারণা ঐ স্তরের নীচেই লুকানো রয়েছে মহাপ্রভুর গুপ্ত সমাধিটি। এরপর আনন্দ বলল তোটা গোপীনাথের বর্তমান পুজারী শ্রীপদ্মনাভ মহাপাত্র মশায়কে সে যখন প্রশ্ন করেছিল—অনেকেই বলেন, চৈতন্যদেবের দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল তোটা গোপীনাথে, তা সে সমাধিটি কি সত্যিই এখানে কোথাও আছে? তখন

শ্রীপদ্মনাভ মহাপাত্র ক্ষণমাত্র চিন্তা না করেই অত্যন্ত সহজ ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন—সমস্ত তোটাই তাঁর সমাধি। বৃদ্ধা এবার বলে উঠলেন আমাদের বিশ্বাসও অনেকটা ঐরকমই। আমরা অর্থাৎ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের লোকরা, জানি এবং মানি শচীনন্দন চৈতন্যদেব অন্তলীলার শেষ ভাগে ঐ গোপীনাথের মন্দিরে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে অলক্ষ্যে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বেশে আনোরপুর পরগণার 'ঘোলা ডুবলী' গ্রামে গিয়ে বেশ কিছুদিন প্রচ্ছন্নভাবে কাল যাপন করেছিলেন।

তড়িতাহতের ন্যায় আনন্দ প্রায় চীৎকার করে উঠল—এসব কি বলছেন আপনি? সুভাষ বসুর সঙ্গে মিল দেখাবার জন্যে আপনাদের এসব মনগড়া কথা। সুভাষ দেশত্যাগী হয়েছিলেন কাবুলীওয়ালার ছদ্মবেশে, তাই সন্ন্যাসী চৈতন্যকেও বুঝি পুরীত্যাগ করাতে চান আপনারা জটাধারী সন্ন্যাসী সাজিয়ে? কিন্তু সুভাষের ছদ্মবেশ ধারণের একটা কারণ ছিল। ষ্টেনগান, ব্রেনগান আর কামান বিমানে সুসজ্জিত মহাপরাক্রান্ত ব্রিটিশের শ্যেনচক্ষুকে ফাঁকি দিতে না পারলে ভারতসীমান্ত পেরিয়ে আফগানিস্থানে প্রবেশ করা একরকম অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। কিন্তু মহাপ্রভুর ত' সেরকম শত্রু কেউ ছিল না।

শান্ত কণ্ঠেই মায়ি বললেন—কে বললে ছিল না? নবদ্বীপ আর পুরী দুই জায়গাতেই তাঁর শত্রুরা তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু এসব কথা এখানে আলোচনা করা ঠিক হবে কি? বলেই ভদ্রমহিলা চতুর্দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন। আনন্দ তাড়াতাড়ি অভয় দিয়ে তাঁকে বলল—'এত ভোরে কেউ এদিকে আসবে না। যাঁরা মর্ণিং ওয়াকে বেরুবেন তাঁরা সমুদ্রের ধার ঘেঁসে ঘেঁসেই চলবেন। সৌভাগ্য বশতঃ আজ শ্মশানও একেবারে ফাঁকা, একটি শবও দাহ হচ্ছে না এখন। সুতরাং আপনি নির্ভয়ে বলে যেতে পারেন।'

অনেকটা নীচু স্বরে কথা বললেন এবার বৃদ্ধা ; চৈতন্যের জন্মই যে হয়েছিল এক বিশৃঙ্খল অরাজকতার যুগে। দিল্লীর সিংহাসনে তখন পাঠান বহ্‌লোল লোদী বসে। ১৪৮৬তে চৈতন্যের আবির্ভাব। আর ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বহ্‌লোলের পুত্র সিকন্দর লোদী সিংহাসনে আরোহণের পরেই আরম্ভ করলেন মথুরার রম্য দেব মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত করার তাণ্ডবলীলা। এদিকে বঙ্গদেশে, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বিশ্বম্ভরের জন্মের ঠিক আগে পর্যন্ত ইলিয়াস্ শাহের বংশধরেরা নানাপ্রকার বিদ্রোহ এবং নরহত্যার বীভৎসতার মধ্যে রাজত্ব চালাচ্ছিলেন। সুলতান রুকন্‌উদ্দীন এরই মধ্যে আবার নিজের অবরোধ অর্থাৎ হারেম পাহারা দেবার জন্য আফ্রিকা থেকে হাবশী খোজাদের আমদানী করে বসলেন। এই হাবশী ক্লীব ক্রীতদাসরা অনেক সময়ই প্রথমে রাজার পরম বিশ্বাসভাজন হয়ে, পরে বিশ্বাসহন্তা ও প্রভুহন্তা হতে শুরু করল। বঙ্গদেশে তাই তখন কাপট্য, ষড়যন্ত্র, ব্যভিচার, নরহত্যা, নরপতি হত্যা, ধর্মবিদ্বেষ এমনই ভয়ানক রুদ্ররূপ ধারণ করেছিল যে তা বর্ণনা করাও সহজসাধ্য নয়। ওদিকে ইউরোপেও তখন প্রচণ্ড সংঘর্ষের কাল চলছে। গোলাপের যুদ্ধ (Wars of the Roses) সবে শেষ হয়েছে, পাশ্চাত্য মধ্যযুগও এসে দাঁড়িয়েছে অবসানের মুহূর্তে। নানারকমের পৌরযুদ্ধ ও বৈদেশিক সমর বিগ্রহে পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যেক জাতি ও সমাজ তখন প্রায় ছিন্নভিন্ন। ১৪৮৫ থেকে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ—এই সময়টিকে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন The begining of the modern Age' বলে। ১৪৮৫তে সপ্তম হেনরী ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। এর মাত্র এক বছর পরেই ভূমিষ্ঠ হলেন আমাদের গোরাচাঁদ। ঐ সময় থেকেই পাশ্চাত্য জগতে সূচনা হল Renaissance বা পুনরুজ্জীবনের যুগ আর ভারতের পূর্ব দিগন্তে ভাগিরথী তীরের বন্দর-সহর নবদ্বীপেও অভ্যুদয় ঘটল ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের নব মন্ত্রোদ্গাতা যুগসূর্য গৌরাঙ্গ

মহাপ্রভুর। কিন্তু পুনরুজ্জীবনের উদার সংগীত যিনি শোনাবেন উদাত্ত ব্যঞ্জনায়, শান্তি কি তাঁর কপালে থাকে কখনও? ছিল কি বুদ্ধের? ছিল কি যিশুর? ছিল কি হজরত মহম্মদের? তাই নবদ্বীপই বল আর পুরীই বল আমাদের গৌরহরিরও শত্রুর অভাব ছিল না কোথাও? নবদ্বীপে যেমন, সকল 'পাষণ্ডী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে' (চৈ-ভাঃ), যেমন পাষণ্ডী প্রধান গোপাল চাপাল (চৈ, চঃ, আঃ ১৭।৩৭), আরিন্দা ব্রাহ্মণ গোপাল চক্রবর্তী (চৈঃ চঃ, অঃ ৩।১৮৮), ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র খান (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১০১) এর মত ঘোর সমাজবিরোধী লোকের ছড়াছড়ি, উৎকলেও তেমনি স্বার্থান্বেষী স্মার্ত, ছদ্ম-বৌদ্ধ এবং মন্দির পাণ্ডাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সামন্ত সর্দার ভঞ্জরাও (Bhanja) নানাভাবে চৈতন্য আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তাকে খর্ব করতে উঠে পড়ে লেগেছিল তখন। আর এদের সবাইকে সমস্ত শক্তি দিয়ে উৎসাহ জুগিয়ে চলেছিল প্রতাপরুদ্রের ক্রুর সিংহাসনলোভী মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর।

'গোবিন্দ বিদ্যাধর।' বিস্ময়ের আতিশয্যে আনন্দ আর নীরব থাকতে পারল না। এই বৃদ্ধাও তাহলে জানেন গোবিন্দ বিদ্যাধরের ষড়যন্ত্রের কথা?

হ্যাঁ, গোবিন্দ বিদ্যাধর। মহাপ্রভু যদি সবার অলক্ষ্যে সেদিন অদৃশ্য হয়ে না যেতেন তোটাগোপীনাথে, তাহলে ঐ গোবিন্দ-বিদ্যাধরের অনুচররাই তাঁর জীবনান্ত ঘটাত এই নীলাচলের বুকে। উড়িষ্যার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এটা ধরতে পারা যায় সহজেই।

প্রভুজীর ধারণার সংগে মহিলার সিদ্ধান্তের এমন আশ্চর্য্য মিল দেখে—কৌতূহল আরও শতগুণ বৃদ্ধি পেল আনন্দের। যা কিছু এতক্ষণ বলেছেন এই গহনা ঝলমল-অঙ্গ বর্ষীয়সী তবু রূপবতী মহিলা তার সমস্তটাই ত' পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাসের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত—। কোথাও অকারণ ভাব-

প্রবণতার চিহ্ন নেই, নেই কোন বাড়াবাড়িও। তবে? তবে ওঁর একটু আগে বলা ঐ কথাটার অর্থ কি? মহাপ্রভু গোপীনাথ মন্দিরে আকস্মিকভাবে অন্তর্হিত হয়ে জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর বেশে বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে কালযাপন করেছিলেন 'ঘোলা ছুবলী' নামক এক গ্রামে?

শান্তা মায়ি হাতের ধূপকাঠির বাণ্ডিলটা আস্তে করে নামিয়ে রাখলেন বালির ওপরে। তারপর বললেন পুনর্বার, চারদিকের শত্রুতা ছাড়াও আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল ঠাকুর গৌরের শ্রীক্ষেত্র ত্যাগের। রথযাত্রার কিছু আগে প্রতিবছরের মতই সেবারও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সদলবলে পুরীতে এসে উপস্থিত হলেন। চৈতন্যদেবের নিয়োজিত জননীর তত্বাবধায়ক দামোদর পণ্ডিতও এলেন তাঁদের সহযাত্রী হয়ে। এসে দিলেন সেই হৃদয়বিদারী সংবাদ। চৈতন্যদেবের জীবনসবস্ব, তাঁর সমস্ত কর্মপ্রেরণার উৎস গোমুখ -গঙ্গোত্রী শচীদেবী আর ইহলোকে নেই। যে নিমাই ঘর ছেড়ে ছিলেন কিন্তু মাকে ছাড়েন নি কখনও, যে নিমাই প্রথম সন্ন্যাসী হয়ে, শান্তিপুরে ক্রন্দনমাখা জননীর চরণপ্রান্তে সাশ্রু নেত্রে লুটিয়ে পড়েছিলেন একেবারে এবং তারপর—

কাঁদিয়া বলেন প্রভু, শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হইতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে॥
জানি বা না জানি যদি করিনু সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই যে করিব॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

সন্ন্যাসগ্রহণের বহু পরেও বার বার যাকে বলতে শোনা গেছে—

গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময় ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

সেই পরম মাতৃভক্ত সন্ন্যাসীর অন্তরে প্রাণাধিক প্রিয় জননীর তিরোভাবের খবর যে কী নিদারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল তা বাইরে থেকে হঠাৎ কারুর বোধগম্য না হলেও এ কথা একপ্রকার নিশ্চিত যে, এই মায়িক জগতের প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রধান সংযোগসূত্রই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল চিরদিনের মত। যে মা'র নির্দ্দেশে তিনি শ্রীক্ষেত্রকে বেছে নিয়েছিলেন নিজের ধর্মপ্রচারের লীলাক্ষেত্ররূপে, সেই মা-ই যখন লোকান্তরিত হলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই এর পরেও শ্রীক্ষেত্রবাস তাঁর পক্ষে এক মর্মান্তিক বেদনাদায়ক ব্যাপার হয়েই দাঁড়িয়েছিল সম্ভবতঃ।

আনন্দ শুধাল—'কিন্তু আপনি যে একটু আগে বললেন শচীনন্দন চৈতন্যদেব গোপীনাথের মন্দিরে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে পড়ে অলক্ষ্যে জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর বেশে আনোরপুর পরগণার ঘোলা দুবলী গ্রামে গিয়ে আত্মগোপন করেন, তা আপনার কি বিশ্বাস হয় মানুষের এই পঞ্চভূতে তৈরী দেহটা কখনও অদৃশ্য হতে পারে?

'তা' পারবে না কেন? পতঞ্জলি বলেন—কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুল সমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্। এর মানে শরীর ও আকাশ এই উভয়ের সম্বন্ধের প্রতি সংযম প্রযুক্ত হলে যোগীর দেহ তুলার মত লঘু হয়। এই অবস্থায় যোগী আকাশপথে বিচরণও করতে পারে। অর্থাৎ ইথারের সঙ্গে দেহের যে সম্বন্ধ আছে, সংযম প্রক্রিয়ার ফলে সেই সম্বন্ধে অভিনব পরিবর্তন

ঘটে। এই অবস্থায় দেহ তুলার মত হালকা হয়ে ওঠে আর সেই কারণেই তা এখন অনায়াসে ইথারের ওপরে ভেসে বেড়াতে সক্ষম হয়।'

মহিলার কথা বলার ভঙ্গীতে এমন এক প্রত্যয় বলিষ্ঠতার সুর শাণিত ইস্পাতের মত ঝিকমিক করে ওঠে প্রতি মুহূর্তে যে, ওঁর কোন কথা অবিশ্বাস করাও বেশ কঠিন হয়ে পড়ে আনন্দের পক্ষে।

শান্তা মায়ি বলে চললেন—'কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাও ত' আমাদের ঐ গৌরাঙ্গসুন্দরই। আমরা অবশ্য তাঁকে ডাকি গোরাচাঁদের বদলে আউলিয়া চাঁদ বলে। আরবী ভাষায় আউল শব্দের মানে হচ্ছে আদি। আমাদের সম্প্রদায়ের স্রষ্টা হিসেবে উনিই হচ্ছেন আদি পুরুষ। স্থান-বিশেষে আউলিয়া অর্থে সিদ্ধপুরুষও বুঝান হয়—যদিও।'

আনন্দ প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হল এবার—চৈতন্যদেব সৃষ্টি করেছিলেন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের? আপনার মতন একজন ইতিহাস-বিজ্ঞা মহিলার মুখ থেকে এমন অনৈতিহাসিক কথা শুনব আমি ভাবতে পারিনি, মা।

অনৈতিহাসিক বলছ কেন, মাণিক? আমার বয়েসের আধ-খানাও তোমার বয়েস হয়েছে কিনা সন্দেহ। আমি অকারণে কতক-গুলো প্রমাণহীন যুক্তিহীন প্রলাপ বকে যাব এই বার্দ্ধক্যে, এটাই কি তোমার বিশ্বাস? আগে সব কথা আমার শুনেই নাও না, তার পর আমার সম্বন্ধে যা খুশি ভেবে নেবার অধিকার ত' তোমার থাকবেই। ক্ষণিকের বিরতি দিয়ে পুনশ্চ কথা কইলেন মায়ি—বলেছিলাম গোপীনাথের মন্দিরে উধাও হয়ে প্রথমে আনোরপুর পরগণার ঘোলা ডুবলী গ্রামে এসে বেশ কয় বছর বাস করেন মহাপ্রভু। পরে, উলাগ্রামে মহাদেব বারুই এর বরজে গিয়ে তাকে দর্শন দান করলে সন্তানহীন মহাদেব মহাপ্রভুকে বার বছর আপন

পুত্রের মত লালন-পালন করেন। এরপর ছদ্ম করে মহাপ্রভু মহাদেব বারুইএর গৃহত্যাগ করে এক গন্ধবণিকের ঘরে আশ্রয় নেন। সেখানে অল্প কিছুদিন থেকে চলে যান এক ভূস্বামীর বাড়ীতে। সেখানে বাস করেন প্রায় দেড় বছর। অনন্তর পূর্ববঙ্গের অনেকগুলি স্থান পরিভ্রমণ শেষে একসময় গিয়ে বাস করতে থাকেন বেজড়া নামে একটি গ্রামে। এই বেজড়াতেই আমাদের আউলিয়া চাঁদের অর্থাৎ নররূপধারী গোরাচাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন বাইশজন ভক্ত। সেই বাইশজনের নাম ছিল— নয়ন, লক্ষ্মীকান্ত, হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল, নিত্যানন্দ দাস, খেলারাম উদাসীন, কৃষ্ণদাস, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, শঙ্কর, নিতাই ঘোষ, আনন্দ গোঁসাই, মনোহর দাস, বিষ্ণু দাস, কিনু, গোবিন্দ, শ্যাম কাঁসারি, ভীম রায় রাজপুত, পাঁচু রুইদাস, নিধিরাম ঘোষ আর শিশুরাম। আউলিয়া চাঁদ আর ঐ বাইশজন শিষ্যকে নিয়ে আমাদের সম্প্রদায়ে একটি ভারী চমৎকার গীত শুনতে পাওয়া যায়।

এ ভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো।
এর নাইকো রোষ সদাই তোষ,
মুখে বলে সত্য বলো॥
এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একটি মন,
বাহু তুলে কল্লে প্রেমে ঢলাঢল॥
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়।
এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো॥

এখন যে পর্য্যন্ত শুনলে সেটুকুই বিশ্লেষণ কর, দেখবে এই টুকুর মধ্যেই চৈতন্যের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের আউলিয়া চাঁদের মধ্যে খুঁজে পাবে। প্রথমেই লক্ষ্য কর ঐ নামগুলি। অধিকাংশই সদ্গোপ, কেউ বা রুইদাস, কেউ রাজপুত, আবার কেউ কাঁসারি।

অর্থাৎ সমাজে যাদের নীচে ফেলে রাখা হয়েছে ঐ বাইশজনই সেই শ্রেণীভুক্ত। এর আগেও যে দুইজনের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদেরও একজন ছিল বারুই, অপরজন গন্ধবণিক। ওঁদের মধ্যে একটিও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্য নেই। ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন সামাজিক অবহেলা আর পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে এই শ্রেণীর মানুষরা কিছুটা সাম্যবাদী সদ্যাগত ইসলাম ধর্মের প্রতি যখন আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল ক্রমে ক্রমে, ঠিক সেই সময়ে কৃষ্ণ নামের জোয়ার বইয়ে অবজ্ঞাত নিষ্পেষিত তথাকথিত এই নীচু শ্রেণীকেই সর্বাগ্রে তাঁর সমদর্শী উদার বক্ষপটে জড়িয়ে ধরেছিলেন গৌরহরি। অপরিণামদর্শী সমাজনেতাদের সামাজিক শাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই তিনি এমনটি করে সনাতন ধর্মকে নিশ্চিত অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এক্ষেত্রেও দেখুন, মূলতঃ গোরাচাঁদ হলেও যাঁর ছদ্মনাম দিয়েছিলেন তাঁর ভক্তবৃন্দ আউলিয়া চাঁদ, তিনিও তাঁর অনুচর করলেন ঐ নিম্ন-শ্রেণীর মানুষদেরই। তারপরে গীতের মধ্যে প্রশ্ন করছে—আউলিয়া চাঁদ এলো কোথা থেকে? এ ভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো—অর্থাৎ তাঁর পূর্ব ইতিহাস তাঁর প্রথম ভক্তদলের কাছেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তা ত' থাকবেই অজানা। মহাপ্রভু নীলাচল থেকে পালিয়ে গিয়ে তখন যে অজ্ঞাতবাস করছিলেন, তাঁর পরিচয় তিনি জানতেই দেন নি যে কাউকে। গানে আরও বলছে—আউলিয়া চাঁদ হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায় আবার বাহু তুলে কল্লে প্রেমে ঢলাঢল। এসমস্ত গুণই ত' ছিল গোরা চাঁদেরই। এমন কি, বাহুতুলে নৃত্য করাটা পর্য্যন্ত। এছাড়াও আমাদের সম্প্রদায়ের সকলেই জানে—আউলিয়া চাঁদ ছিলেন দীর্ঘকায়, আজানুলম্বিত ছিল তাঁর দুইবাহু। তিনি ফল-মূল লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন।

যে বাইশজন শিষ্যের নাম করলেন আপনি, তাঁদের আত্মীয়-

কুটুম্ব কেউ বেঁচে নেই এখন? 'ওমা, তা থাকবেন না কেন? ঘোষপাড়ার নাম শুনেছ? মুরতিপুর গ্রামের ঘোষপাড়া? যা আজ সারা বাংলার কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থান। সেখানকার পালদের বাড়ীতে এখনও পাবে আউলিয়া চাঁদের কমণ্ডলু থেকে দেওয়া সেই দৈবশক্তিসম্পন্ন গঙ্গাজল।

'কোন্ পাল?'

ঐ যে বাইশজন শিষ্য হয়ে ছিলেন প্রথম—আউলিয়া চাঁদের। তাঁদেরই মধ্যে ছিলেন মহাভাগ্যবান রামশরণ পাল। ইনি নিজে ছিলেন সদ্‌গোপ, বাস ছিল চাকদহের কাছে জগদীশপুরে। প্রথমা পত্নী এবং দুই কন্যার মৃত্যু হলে, রামশরণ জগদীশপুরেরই নিকটবর্তী গোবিন্দপুর নিবাসী গোবিন্দ ঘোষের কন্যা সরস্বতীকে পত্নীত্বে বরণ করেন। এই সরস্বতীই আজ সমস্ত বঙ্গবাসীর কাছে সতী-মা নামে বিখ্যাতা। এঁর কথা পরে বলছি। এই সরস্বতীর গর্ভে রামশরণের পুত্র রামদুলাল এবং দুটি মেয়ে অন্নদা আর ভবানীর জন্ম হয়। সরস্বতীকে বিয়ে করার অল্পদিন পরেই নদীয়া জেলার অন্তর্গত মুরতিপুর গ্রামে গিয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে বাসা করে থাকেন রামশরণ। সেখানকার জমিদার বেনাপুরের খাঁ রাজদের বংশোদ্ভব রায় রায়ান দেওয়ান পদ্মলোচন রায় বাহাদুরের গৃহে অতিথি সেবার চাকরী পান তিনি। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রভু তাঁকে উখ্‌ড়া পরগণার একটি মহালে নায়েব করে পাঠান। সেই মহালের কাছারীবাড়ীতেই হঠাৎ একদিন এক আজানুলম্বিত বাহু সুগৌর বর্ণের মহাপুরুষ এসে আবির্ভূত হলেন। আর সেই দিনই উঠল রামশরণের প্রায় জীবনান্তকর পূর্বসঞ্চিত শূলবেদনা, রামশরণ অসহ্য যাতনায় মূর্চ্ছিত হলেন। তখন সেই মহাপুরুষ তাঁর কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে মুহূর্তে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুলেছিলেন রামশরণকে। এই কমণ্ডলুর জলের

কথাই বলছিলাম একটু আগে যা এখনও রাখা আছে ঘোষপাড়ার পালদের বাড়ীতে সযত্নে। রামশরণ সেদিন অনেক সাধ্যসাধনা করেও সেই মহাপুরুষের কাছ থেকে সন্ন্যাস নিতে পারেন নি। মহাপুরুষ তাঁকে সংসারে থেকেই দশজনের মঙ্গল করবার ব্রত গ্রহণ করতে বললেন, এবং বিদায় নেবার আগে দিয়ে গেলেন নিজের কমণ্ডলুর সেই দৈবশক্তিসম্পন্ন গঙ্গাজল। রামশরণ বহু আগে থেকেই অতিথিভক্ত, পরমার্থপ্রিয় ও সাত্ত্বিক মনোবৃত্তির লোক ছিলেন। মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করার পরই উনি জমিদারের কাজ ছেড়ে দিয়ে আবার চলে গেলেন মুরতিপুরের ঘোষপাড়ায়। এবং অচিরেই সকলে দেখতে পেল সেই মহাপুরুষের আশীর্বাদে রামশরণও অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে উঠলেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই নদীয়া জেলার অজ্ঞাত গ্রাম মুরতিপুরের অখ্যাত সদ্‌গোপ-পল্লী ঘোষপাড়া বঙ্গবিখ্যাত হয়ে উঠল। বঙ্গবিখ্যাত হয়ে উঠল বলছেন—কিন্তু কোন নামকরা লোক কখনও আপনাদের ঐ কর্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছেন বলে ত' আমি শুনি নি।

তা আবার হয়নি! রামশরণের ছেলে রামদুলালের সময় অনেক ধনী-মানী-জ্ঞানী লোকই গ্রহণ করেছিলেন আমাদের সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্রের মূল সূত্র—গুরু সত্য। ভূ-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর স্বয়ং কর্তাভজা মতাবলম্বী হয়েছিলেন আর সেই জন্যেই ত' তাঁর পুত্রপৌত্রাদিবংশপরম্পরায় প্রত্যেকেই নামের প্রথমে ঐ সত্য-শব্দটি যুক্ত করতে শুরু করেছিলেন (নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত বিশ্বকোষ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৩)। যাই হোক, রামদুলাল মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলে, তাঁর মা সরস্বতী ঘোষপাড়ার গদীতে বসেন এবং রমণী হয়েও, দীর্ঘদিন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে কর্তাভজাসম্প্রদায়কে নেতৃত্ব প্রদান করে সবারই অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন হয়ে সতী-মা আখ্যায় ভূষিতা হন।

সেই মহাপুরুষের কি হল তা ত' বললেন না?

বলছি। সেই মহাপুরুষই যে আসলে গৌরাঙ্গদেব এবং কর্তাভজাদের আউলিয়া চাঁদ সেটা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছ তুমি অনেক আগেই। গৌরাঙ্গদেব যেমন জাত-বেজাতের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেননি কখনও, আউলিয়া চাঁদের প্রবর্তিত এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের লোকদেরও তেমনি জাত-বিচার ও অন্নবিচার একেবারেই নেই। সকল বর্ণের লোকই, এমন কি মুসলমানগণও এ ধর্ম গ্রহণ করার অধিকারী (নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত বিশ্বকোষ তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৫)। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মদিন দোলপূর্ণিমাতেই এখনও সবচেয়ে বড় উৎসব হয় আমাদের ঐ ঘোষপাড়ার। দোল আর রথযাত্রা একই দিনে হয়ে থাকে ওখানে। ঘোষপাড়ায় পালদের বাড়ীতে গেলে আজও সতীমা'র সমাজ দেখতে পাবে—সমাজ মানে সমাধি আর কি! দেখতে পাবে দাড়িমতলা। সেই দাড়িমতলারই পেছনে দোতলার একটি ঘরের মধ্যে সযত্নে রাখা আছে আউলিয়া চাঁদের আশা বাড়ী ও কন্থা, রামশরণের খড়ম, আর রামদুলালের অস্থি। এই ঘরের নাম ঠাকুর ঘর। এখানে রোজ আরতি হয়, আগে নিত্য হত হরিসংকীর্তনও।

আউলিয়া চাঁদ শেষ পর্য্যন্ত আর আসেন নি তাহলে রামশরণের কাছে?

এসেছিলেন। আমাদের সম্প্রদায়ের সকলেই বলেন—আউলিয়া চাঁদ রামশরণের ঐ ঘোষপাড়ার বাড়ীতে গিয়ে নাকি অনেকদিন ছিলেন।

তারপর? আনন্দ ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছে আউলিয়া চাঁদের শেষের খবরটুকু জানবার ব্যগ্রতায়।

এরপর ইতিহাস বলছে, চাকদহের কাছে পরারীগ্রামে আউলিয়া চাঁদ বাস করেছিলেন বছরের পর বছর, দীর্ঘকাল। শেষে ১৬৯১ শকে বোয়ালে নামক গ্রামে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। সেই

সময় তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন রামশরণ, হটু ঘোষ প্রভৃতি আটজন প্রধান শিষ্য। তাঁরা বোয়ালেতেই আউলিয়া চাঁদের কন্থার সমাজ দিয়ে তাঁর দেহটি নিয়ে চলে যান—। এই পর্য্যন্ত বলেই ভদ্রমহিলা পুনশ্চ চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন একবার চারিধার, তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললেন—'তাঁর দেহটা নিয়ে চলে গেলেন ওঁরা চাকদহের কাছে সেই পরারী গ্রামে। সেখানেই সমাহিত করা হয় সেই দিব্য শরীরটিকে।'

শিরদাঁড়া সোজা করে বসল এবার আনন্দ। সন্ধানী দৃষ্টি তার বৃদ্ধার চোখের ওপর ফেলে শেষ প্রশ্ন করল সে—'দেখেছেন সেই সমাধি আপনার নিজের চোখে?'

যাবে নাকি সেখানে? চল না আমার সঙ্গে। পরশুর পরের দিন ত' আমি যাচ্ছিই!'

যাচ্ছেন? পরশুর পরের দিন?

'হ্যাঁ গো!' ভদ্রমহিলার সারা মুখে আবার সরল হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল আনন্দ। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে জানাল—বেশ, যাব। তবে কেবল পরারীতে নয়, আমায় কিন্তু নিয়ে যেতে হবে মুরতিপুরের ঘোষপাড়াতেও।

সে ত' খুব ভাল কথা। কিন্তু তুমিও কথা দাও আমাকে তুমি একবার খড়দহে গিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ব্যবহৃত তার-যন্ত্র আর নীলকণ্ঠ মহাদেব!

হেসে ফেলল এবার আনন্দ বৃদ্ধার আব্দারের সুরে সরলতা ভরা কথাগুলি শুনে। বলল—কথা দিলাম মায়ি। কিন্তু ইতিহাস শোনাতে গিয়ে আপনি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বিনা দ্বিধায় আমার সামনে হাজির করে ফেললেন। বলছেন আউলিয়া চাঁদ দেহ রাখলেন ১৬৯১ শকে। আর নিমাই জন্মেছিলেন ১৪০৭

শকে। তাহলে কি গৌরাঙ্গদেব বেঁচেছিলেন ২৮৪ বছর? এও কি সম্ভব?

কেন? অসম্ভব কেন? এই পুরীতেই ন্যাংটাবাবা ত' কয়েক বছর আগেও বেঁচে ছিলেন, তাঁকে আমিও দেখেছি। কে না জানে ন্যাংটাবাবা আসলে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষাগুরু সেই তোতাপুরী (শংকরনাথ রায়ের—ভারতের সাধক)। এখন হিসেব করে দেখ ত' তাঁর বয়স কত হয়েছিল। ত্রৈলঙ্গস্বামী কত বছর আয়ুলাভ করেছিলেন—জান না বুঝি? উত্তর কাশীর লাকৃসেশ্বর মহাদেবের স্থানে যে রামানন্দ অবধূতকে আমি দেখে এসেছি, তিনি তাঁর তেতাল্লিশ বছর বয়সে সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এখন অঙ্ক কষে বুঝে নাও অবধূতের বয়সটা কত। আর আমাদের গোরাচাঁদ ত' ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর, আউলিয়া চাঁদকে কর্তাভজারাও স্বীকার করেন ঈশ্বরের অবতার বলেই—তাঁর পক্ষে এ ক'টা বছর বাঁচা কি খুব অস্বাভাবিক কোনও কাজ? গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথকে জরা-মৃত্যু-জয়ের পথের নির্দেশ দিয়ে বললেন—তোমায় হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগের সাধন নিতে হবে। হঠযোগ দিয়ে রাজযোগের দৃঢ় সোপান আগে তৈরী করে নিতে হয়। প্রথমে তোমায় ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলিক ও কপাল ভাতি—এই ষঠকর্ম সাধন করতে হবে। এতে সাধক দেহে ফুটে ওঠে নানাপ্রকার শক্তি। এরই পরবর্তী স্তরে হবে জরা-মরণকে আয়ত্বে আনার জন্যে কর্মারম্ভ। মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, উড্ডান, মূলবন্ধ, জালন্ধব বন্ধ, বিপরীত করণী, বজ্রোলী, শক্তিচালন—এই দশটি মুদ্রার সিদ্ধ হলেই জরা-মৃত্যুর ওপর আসে যোগীর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব। এই পর্য্যন্ত বেশ গম্ভীর স্বরেই সব কথা বলার পর, হঠাৎ স্নেহের হাসিতে দুই নয়ন উজ্জ্বল করে, আনন্দের দুই গালে নিজের দুই করতল আলতো ভাবে বুলিয়ে দিয়ে অপূর্ব

এক স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—আমি ত' আমার সব কথাই তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না, মাণিক। তুমি বললে—তুমি গবেষণা করছ চৈতন্যের শেষ লীলার ওপর। তাই কর্তাভজাদের বিশ্বাসের কথা তোমায় জানালাম। এখন তুমি চল। নিজের চোখে সব দেখবে, শুনবে, পড়বে, বিচার করবে, তারপর সিদ্ধান্ত নেবে। তবে, একটা জিনিষ তোমায় আমি দেব আনন্দ—যা হয়ত তোমার গবেষণার কাজকে এক সম্পূর্ণ নতুন রাস্তার মোড়ে এনে দাঁড় করিয়ে ছাড়বে।

'কী সে জিনিষ মায়ি ?'

কতকগুলো তালপাতার ওপরে কিছু লেখা। যে মহাদেব বারুই-এর ঘরে আউলিয়া চাঁদ বার বছর ছিলেন, তারই এক বংশধর ওগুলো আমাকে দিয়েছে। ও বলেছে ঐ তালপাতাগুলো ও ওর জেঠিমার কাছ থেকে পেয়েছে। জেঠিমা ওকে বলেছিল বহুদিন আগে এক ফকির নাকি ঐ তালপাতাগুলোতে বিষহরির মন্ত্র লিখে রেখে গেছে। তা আমি ওগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে দেখি একটা পাতায় সংস্কৃতে লেখা—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো।

(শ্রীপদ্যাবলী। ৭৪)

চমকে উঠল আনন্দ—'আরে এত বিষহরির মন্ত্র নয়, এ যে চৈতন্যদেবের স্বরচিত গীতের একটি পদ! এর অর্থ—আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য নই বা শূদ্রও নই।

বৃদ্ধা বলেই চললেন—আর তারই নীচে প্রাচীন বাংলায় লেখা মাত্র দুইটি ছত্র।

গত ঈশান গতা মাতা গত স্বরূপ-রায়।
একেলা মুই পুড়িয়া কান্দি জগন্নাথের পায়॥

এখন তোমায় ভেবে বের করতে হবে মাণিক, কে এই মুই। উত্তেজনার আধিক্যে সংযম হারিয়ে ফেলে শান্তা মায়ির দুই হাত চেপে ধরে প্রায় চীৎকার করে উঠল আনন্দ—কোথায় আছে মায়ি? কোথায় আছে ঐ তালপাতাগুলো?

মেদনীপুরে, আমার এক সখির বাসায়। কিন্তু অমন চঞ্চল হলে চলবে না যে মাণিক! স্থির হও শান্ত হও! পরশুর পরের দিন যাচ্ছই যখন আমার সঙ্গে তখন আর চিন্তা কি! সব দেখিয়ে দেব আমি এক এক করে।

কোথায় দেখা হবে পরশুর পরের দিন আপনার সঙ্গে আমার?

'মন্দিরে। ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের সামনে বিকেল ঠিক চারটেয়।

॥ আট ॥

এক নতুন ভাবনার হাওয়া লেগেছে আনন্দের গবেষণা-নৌকোর পালে। এ-হাওয়ার বেগের তীব্রতায় মাঝে মাঝেই অস্থির হয়ে পড়ছে, অধৈর্য্য হয়ে পড়তে চাইছে আনন্দের মন। প্রভুজী কবে যে ফিরবেন রাজমহেন্দ্রী থেকে রায় রামানন্দের স্বহস্ত লিখিত পত্রখানি সংগ্রহ করে তার কোন নিশ্চিত খবরই আজ অবধি জানতে পারে নি সে। অথচ আগামীকাল তাকে যাত্রা করতে হচ্ছে শান্তামায়ির সঙ্গে নদীয়া জেলার মুরতিপুর গ্রামের সদগোপ পল্লী ঘোষপাড়ার উদ্দেশে। যাতায়াতে দিন সাতেক সময় ত' লাগবেই অন্ততঃ! এরই মধ্যে যদি প্রভুজী প্রত্যাবর্তন করে তাকে খোঁজাখুঁজি করেন? একবার যদি বৈষ্ণবীর সঙ্গে দেখা হত তার, তাহলে তাকেই বলে যেত সে তার আগামীকালের পুরীত্যাগের কথা। কিন্তু কোথায় বৈষ্ণবী! সে কোথায় থাকে—তাও যে জানে না আনন্দ আজ অবধি।

সকাল আটটা নাগাদ তোটা গোপীনাথের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতে হতে এই কথাগুলিই চিন্তা করছিল আনন্দ। কখনও কখনও মনে পড়ে যাচ্ছিল তাঁর বিস্ময়কর চরিত্রের তেজস্বিনী শান্তামায়ির এত বয়সেও টান-টান চামড়ার সেই স্নেহ-সুন্দর মুখখানিকেও। বলতে চান কি ভদ্র মহিলা? মহাপ্রভু এই দারিদ্র্যদীর্ণ দেশের পীড়ন-জর্জর দুর্ভাগাদের মঙ্গলার্থে আবার একটি নতুন ধর্ম প্রচার করে গেছেন সর্বসাকুল্যে দু'শ চুরাশী বছর জীবিত

থেকে? তবে ত' জীবিতাবস্থাতেই তিনি শুনে গেছেন—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরর রাজসভায় তাঁর অবতারত্ব নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সেই অদ্ভুত তর্কযুদ্ধের কথা, যে তর্ক যুদ্ধের মীমাংসার জন্য শেষ পর্য্যন্ত এমন এক করলিপি প্রস্তুত করা হ'ল যাতে ঘোষিত হ'ল—'চৈতন্যো ভগবদ্‌ভক্তো ন চ পূর্ণোন্ চাংশকঃ, অর্থাৎ চৈতন্য শুধুই ভগবানের ভক্ত, তিনি পূর্ণাবতার ত ননই, অংশাবতারও বলা চলে না তাঁকে। আবার, এ সংবাদও নিশ্চয়ই তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, ঐ করলিপির অন্য রকম ব্যাখ্যা করে চমৎকৃত ও হতবাক করে দিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের সামনেই উক্ত চৈতন্যবিদ্বেষী পণ্ডিতদের—শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতবংশোদ্ভব জনৈক শাস্ত্রবিশারদ গোস্বামী স্বয়ং ঐ রাজসভায় উপস্থিত হয়ে। অদ্বৈতবংশোদ্ভব তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছিলেন—চৈতন্যো ভগবদ্ভক্তোন, অংশকোন, কিন্তু পূর্ণএব অর্থাৎ চৈতন্য একজন ভগবদ্ভক্ত বা ভগবানের অংশাবতার নন, তিনি পূর্ণ।

গোপীনাথ মূর্তির মুখোমুখি হয়ে বসে মন্দিরের বারান্দায় যে লোকটি নিষ্পলক দৃষ্টিতে অশ্রু বিসর্জন করছিল নিঃশব্দে, তাকে দেখে আনন্দের বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা রইল না। ভণ্ড শান্তিপ্রিয় সেন নির্জনে একাকী বসে কৃষ্ণের জন্যে কাঁদছে। এ আবার কি নতুন এক অভিনয়।

ঠিক এই সময় কাণের কাছে মেয়েলি কণ্ঠ ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করল—'অমন অবাক হয়ে কি দেখছ গোবর্ধন গোঁসাই?'

চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখে—মাধবী!

বৈষ্ণবী ইঙ্গিতে তাকে ডেকে নিয়ে গেল মন্দির সংলগ্ন ভোটায় অর্থাৎ বাগানে। অনেকটা কাঁঠালগাছের মত দেখতে বিরাট বিরাট পলাং গাছে ভরে আছে বাগানটা। শ্রীচৈতন্যদেব পায়ে হেঁটে কতবার আসা যাওয়া করেছেন এই বাগানের মধ্যে দিয়ে। তাঁর চরণরেণুলাভে ধন্য হয়েছে এ বাগানের প্রতিটি ধূলিকণাও।

হাত ধরে জোর করে একটি গাছের নীচে বসিয়ে মাধবী বলল, 'যাঁকে তুমি দেখছিলে এতক্ষণ, ওঁকে তুমি চেন না। অথচ উনিই কিন্তু প্রভুজীকে এসে প্রথম খবর দেন তোমার রিসার্চ সম্বন্ধে।

তুমি ওঁকে চেন?

চিনি। উনি ডঃ এস. পি. সেন, জার্মানী থেকে অ্যান্থ্রোপোলজিতে ডক্টরেট পেয়েছিলেন ওঁর ছাত্র জীবনে। ওঁর ছেলের সঙ্গেই ত' আমার…… এতক্ষণের হাসিখুশি মেয়েটা মুহূর্তে যেন নিভে গেল। শান্তিপ্রিয় সেন ডক্টরেট? এঁরই ছেলের সঙ্গে দ্বৈত জীবন-যাবনের স্বপ্নে একদিন রঙ্গীন হয়ে উঠেছিল কুমারী মাধবীর প্রথম যৌবন?

ক্ষণকাল দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় কাটিয়ে অবশেষে জিজ্ঞেস না করে পারল না আনন্দ। আচ্ছা একজন ডক্টরেট হয়েও উনি অমন ভাঁড়ামি করেন কেন বল ত'? কখনও চৈতন্যকে ভগবান বলেন, আবার কখনও চৈতন্যের বিরুদ্ধে যা মুখে আসে তাই বলে তর্ক জুড়ে দেন। এরকম ব্যবহারের মানে কি?

অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল বৈষ্ণবী—পুত্রের মৃত্যুর পর থেকেই, আজ চার বছর হল, উনিও বাপির সঙ্গে চৈতন্য ব্রত গ্রহণ করেছেন। চৈতন্যদেবকে ওঁর চেয়ে বেশি ভক্তি ক'জন করে—আমি জানি নে। উনি এই সব তর্কবিতর্ক করেন বাপি মানে প্রভুজীরই নির্দেশে। এমন তর্কাতর্কি না করলে নাকি মহাপ্রভু সম্বন্ধে অন্যদের বক্তব্য বিষয় জানতে পাওয়া যায় না কিছুতেই। এই বলে একটু থেমে, আবার পূর্ববৎ স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় জোর করে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল —দেখলে না, একা বসে বসে কাঁদছেন কেমন গোপীনাথের মন্দিরে। এইবার আনন্দ আসল কথাটা পাড়ল। 'দিন সাতেকের জন্য আমি বাইরে যাচ্ছি কাল।'

কোথায় যাবে ?

এখন বলতে পারব না, ফিরে এসে জানাব।

গবেষণারই কাজে যাচ্ছ কি ?

হ্যাঁ, তা একরকম বলতে পার।

কিন্তু কেন ? প্রভুজী ত' রাজমহেন্দ্রী থেকে ফিরে আসতে পারেন যে-কোনদিন। তাঁকে বলবে, সাতদিনের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসছি। তিনি যে প্রমাণ সংগ্রহ করতে গেছেন আমি যে তারই অপেক্ষায় বসে আছি অধীর হয়ে। আর তাছাড়া, তিনি পুরীতে এসে এবার আমাকে যে দেখিয়ে দেবেন সেই জায়গাটা যেখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীঅঙ্গ সমাধিস্থ করা হয়েছিল আজ থেকে চার শ' চুয়াল্লিশ বছর আগে।

হঠাৎ গলা নামিয়ে বৈষ্ণবী শুনিয়ে বসল অপ্রত্যাশিত এক কথা। বলল—সে জায়গাটাত আমিই দেখিয়ে দিতে পারি তোমাকে, যদি অবশ্য একটি শর্ত রক্ষা করতে রাজী হও তুমি।

তুমি জান ? তুমি দেখেছ সে জায়গাটা ? বাপিই ত' একদিন দেখিয়ে দিয়েছিল আমাকে সেই পরম পবিত্র স্থানটি।

তবে তাই আমায় দেখিয়ে দাও, মাধবী, বল কি তোমার শর্ত আমি নিশ্চয়ই পালন করার চেষ্টা করব। তা কি যেন বলতে যাচ্ছিল বৈষ্ণবী, কিন্তু, মুখ দিয়ে বেরুল না তার একটি কথাও। শুধু চোখ-মুখ অব্যক্ত লজ্জায় বার বার রাঙ্গাই হয়ে উঠল তার। তারপর বেশ কিছুক্ষণ মুখটা নীচের দিকে নামিয়ে রেখে, একসময়, বোধ করি প্রয়োজনীয় সাহসটুকু সঞ্চয় করে নিয়েই, চোখ তুলে একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল— তুমি বলতে অনুমতি দিয়েছ তবে কিন্তু বলছি আমি গোঁসাই। কথাশুনে রাগ করতে পারবে না। একটু আশ্চর্য্য ঠেকল আনন্দের চোখে বৈষ্ণবীর এখনকার ব্যবহার। কী শর্ত আরোপ

করতে চায় এই অনন্যা রূপসী মেয়েটা! কেন ওর এত দ্বিধা এত সংকোচ? বার দুই অকারণেই অল্প কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে মাধুরী বলল—তোমার সংস্পর্শে আসার পর থেকেই আমি ভাবতে শুরু করেছি গোঁসাই, কেবলই ভেবেছি আর ভেবেছি! শেষে মনে হয়েছে বাপির কথাই ঠিক। পুরুষ হয়ত একাই চলতে পারে জীবনে, কিন্তু মেয়েমানুষ বাঁচতেই পারে না স্বাভাবিকভাবে, যদি কোন পুরুষকে অবলম্বন করে তার নারী জীবন লতিয়ে উঠতে না পারে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সরম-রক্তিম মুখ নামিয়ে আপন মনেই হাতের একটি আঙ্গুলের নখ দিয়ে অপর আঙ্গুলের নখ খুঁটল সে। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল—'আমি যদি বিদ্যাপতি বলে ভেবে নিই তোমাকে তবু তুমি কি আমার মধ্যে ললিতাকে দেখতে পাবে না?' অদ্ভুত হেঁয়ালীর মত ঠেকছে মাধবীর প্রশ্নটা। আনন্দ পাল্টা প্রশ্ন করল—তার মানে?'

মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন বিদ্যাপতিকে পাঠিয়েছিলেন নীল মাধব-বিগ্রহের সন্ধানে তখন এই শ্রীক্ষেত্রেরই আশপাশের কোন এক শবর-পল্লীতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাপতি, আদিবাসী শবর সর্দার বিশ্বাবসুর গৃহে। বিশ্বাবসুর একমাত্র কুমারী কন্যা ললিতা পিতার নির্দেশে ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতির সেবা-পরিচর্য্যা করতে গিয়ে কখন নিজেকে হারিয়ে ফেলল যেন ঐ ব্রাহ্মণ যুবকের মধ্যে। তাই, বিদ্যাপতি যেদিন নীলমাধবের অবস্থান কোথায় জানবার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলেন ললিতার কাছে, সেদিন নীলমাধবের সন্ধান জানাতে রাজী হয়েছিল ললিতা কোন্ শর্তে— মনে আছে? শবরী ললিতা ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতিকে নিসংকোচে বলেছিল সেদিন—আমৃত্যু আমাকে যদি তোমার পদসেবা করার অধিকার দাও তোমার ভার্য্যারূপে তবেই আমি জানাব তোমায় বাবা রোজ মাঝরাতে কোথায় যান নীলমাধবের পূজো দিতে।

(স্কন্দপুরাণ, উৎকলখণ্ড) পুনরায় নীরব মাধবী আপন মনেই নখ খুঁটে চলল কিছু সময়? এরপর আবার যখন সে চোখ তুলে চাইল আনন্দ অবাক হয়ে দেখল—আঁখির রেখা তার অশ্রুরেখায় পরিণত। কম্পিত স্বরে বলল সে এবার—আমিও ত' কাশ্মিরী আদিবাসী মায়েরই গর্ভজাতা আর এক ললিতাই। যদি বলি—আমি তোমাকে এই নীলাচলের নীলমাধবের মতই আর এক মস্ত রহস্যময় দিব্য অস্তিত্বের সন্ধান পাইয়ে দেব, নিয়ে যাব তোমাকে পূর্ণব্রহ্ম গৌরহরির পূতাঙ্গ যেখানে মৃত্তিকাগর্ভে শায়িত—সেইখানে, তবে তার প্রতিদানে এই অভাগিনী একাকিনী কাশ্মিরী গর্ভজাতাকে তোমার ঐ আশ্চর্য্য নারীহীন জীবনের সঙ্গিনী করে নিতে রাজী হতে কী পার না তুমি অনুকম্পাভরে? বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে আনন্দ শুধাল—'এসব কেমন কথা বলছ তুমি আজ, বৈষ্ণবী? প্রভুজী, তুমি, আমি, শান্তিপ্রিয় সেন—আমরা সবাই যে এখন চৈতন্যব্রতী, আহারে বিহারে নিদ্রায় জাগরণে এখন যে আমাদের একমাত্র চৈতন্য ছাড়া আর অন্যকিছু ভাববার অধিকারই নেই একেবারে।' বাষ্পরুদ্ধস্বরে সংগে সংগে জবাব দিল মাধবী—'তবু, তবু তুমি আমার এ শর্তের কথা একবার দয়া করে ভেবে দেখবে গোঁসাই—এই আমার মিনতি রইল তোমার কাছে!' এই বলেই দু'চোখ হাতের তালুতে ঢেকে প্রায় দৌড়িয়েই সে অদৃশ্য হয়ে গেল বিরাট জলের ট্যাংকটা যেদিকে আছে, সেদিককার রাস্তা ধরে। বাগানের আর এক প্রান্তে বৃন্দাবনাগত চট-পরা সাধুর কুটিরের প্রতি নজর পড়তেই আনন্দ দেখল কুটিরের অদূরে দণ্ডায়মান মনে হয়, ঐ সাধুরই কিছু ভক্ত শিষ্য হয়ত হবে, বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তারই পানে। মুহূর্তে কাণ মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল আনন্দের।

॥ নয় ॥

বিশ্রী এক ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আশ্রমে ফিরে এল আনন্দ। এমন সংযমী আর বিদূষী মেয়েটি এ কেমন ব্যবহার করল আজ তার সঙ্গে? চৈতন্যের সমাধি দেখানর প্রতিদান হিসেবে একি অদ্ভুত দাবীর শর্ত সে আরোপ করে বসল হঠাৎ? এখন কী করবে আনন্দ? কী করা উচিৎ তার, কী বলা উচিৎ প্রভুজীর পরম স্নেহের ঐ ভাইঝিটিকে?

ঘরের বারান্দায় উঠে দেখে পোষ্টপিওন পত্র রেখে গেছে একধারে। খামের চিঠিটা খুলতেই আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল আনন্দ। প্রভুজী স্বহস্ত লিপিতে চিঠি দিয়েছেন রাজমহেন্দ্রী থেকে। লিখেছেন—যে জিনিসের খোঁজে রাজমহেন্দ্রীতে যাওয়া তা পাওয়া গেছে। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে পুরীতে ফিরতে তাঁর আরও দিন দশ বার দেরী হবে হয়ত। অতএব আনন্দ যেন প্রস্তুত থাকে। শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের পরই তিনি আনন্দকে সর্বাগ্রে নিয়ে যাবেন এবার সারা ভারতের প্রাণপুরুষের শেষ শয্যার সান্নিধ্যে।

এক নিমেষে, এতক্ষণের এত উত্তেজনা, এত ক্ষোভ—মিলিয়ে গেল যেন। চিঠিটা সশ্রদ্ধ চিত্তে কপালে ঠেকাল একবার আনন্দ। তারপর পত্রের শেষের দিকে পুনশ্চ দিয়ে লেখা অংশটুকু পড়ে ফেলল তাড়াতাড়ি: সম্বলপুরনিবাসী আর এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৈষ্ণব কবি শ্রীবৈষ্ণবচরণের লেখা চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের

ছয়শ’ বিরাশী পৃষ্ঠাটা ভাল করে পড়ে নিও একবার। দেখবে কেবল মহাপ্রভুই অন্তর্দ্ধান হলেন না, তাঁর পরেই তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ পার্ষদ যাঁরা ছিলেন—তাঁদেরও অনেকেই এক এক করে অন্তর্দ্ধান করতে লাগলেন। ‘অনেক ভক্ত স্বশরীরে ততক্ষণে অন্তর্দ্ধান হেলে’ (প্রকাশক—ধর্মগ্রন্থ ষ্টোর, আমিনা বাজার কটক-২)। এর মানে কি বুঝতে পারছ? ঐ চৈতন্যবিরোধী চক্র কেবল চৈতন্যকেই লোকচক্ষুর সামনে থেকে সরিয়ে নেয়নি, নিয়েছে তাঁর প্রিয়পার্ষদদেরও বেশ কয়জনকে। কী বীভৎস ব্যাপার ভাবত একবার। ভাগ্যে রঘুনাথ বৃন্দাবনে পলায়ন করেছিলেন, তাই তিনি প্রাণে বেঁচেছিলেন। আচ্ছ, মহাপ্রভু না হয় স্বয়ং ভগবান ছিলেন, অতএব তিনি বিলীন হয়ে গেলেন জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে—সেটা না হয় মেনে নিয়েছিলেন তাঁর ভক্তবৃন্দ। কিন্তু স্বরূপ দামোদর প্রমুখ চৈতন্য-পার্ষদরা? তাঁরা কেউ ত’ আর ভগবান ছিলেন না। তাঁরা উধাও হয়ে গেলেন এক এক করে কোথায় এবং কেন? কেন স্বরূপ দামোদরের মত চৈতন্যের গম্ভীরালীলার অন্তরঙ্গতম সহচরেরও সমাধি খুঁজে পাওয়া যায় না পুরীতে কোথাও—একথা একবারও কি ভেবে দেখেছেন মহাপ্রভুর অনুসারীর দল অথবা ঐতিহাসিকেরা?

মহাত্মা শিশির কান্তি ঘোষ রচিত ‘শ্রী অমিয় নিমাই চরিত’ গ্রন্থের (৬ষ্ঠ খণ্ড) পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে একটা খুবই Interesting foot-note দেওয়া হয়েছে। ভাবীকালের সমস্ত গবেষককেই আমি ঐ ফুট-নোটটি নোট করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। ফুট-নোটে শিশিরবাবু লিখেছেন—চৈতন্যদেবের জীবনের ওপর লিখিত গ্রন্থাবলীর কোন কোনটিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরে “ভক্তগণ সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলে ক্রমে চেতনা পাইলেন, কেবল স্বরূপ নয়। ‘দেখা গেল, তাহার হৃদয় ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।” How queer it sounds!

যদিও আমরা মুখে বলে থাকি অমুকের শোকে আমার হৃদয় অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড ফেটে গেল, বুক ফেটে গেল ইত্যাদি, কিন্তু সত্যিই কি কারুর শোকে আমাদের হৃদ্‌পিণ্ড বা বুক ফাটতে পারে কখনও? চিকিৎসা-বিজ্ঞান কি একথা স্বীকার করে? আর, হৃদ্‌পিণ্ড যদি ফাটেও বা কোন আঘাতে বা অন্য কোন কারণে, তাকে কি বাইরে থেকে দেখতে পায় কেউ? এখন লক্ষ্য করে দেখ ঐ লাইনটি, যাতে বলা হয়েছে—'দেখা গেল, তাহার হৃদয় ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।' হার্ট বা হৃদ্‌পিণ্ড বা হৃদয়কে ফাটা অবস্থায় দেখা যেতে পারে কেবল তখনই, যখন বক্ষদেশে অথবা পৃষ্ঠে কোনও সুগভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, শিশিরকান্তির ঐ 'দেখা গেল' শব্দ দুইটির কেবল একটি অর্থই সম্ভব এখানে—যা হচ্ছে, স্বরূপদামোদরের বুকে অথবা পিঠে এমন কোনও গভীর জখমের গর্ত সৃষ্টি হয়েছিল যার ভেতর দিয়ে তাঁর ক্ষতবিক্ষত বা চিড়-ধরা হৃদ্‌পিণ্ডটা দেখতে পেয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভক্তবৃন্দ। এখন বুঝে নাও, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার সবচেয়ে বড় সেবক, সুহৃদ এবং সহচরের কপালে কী ঘটেছিল শেষ পর্যন্ত।

যাই হোক, তুমি নিজে অত্যন্ত সাবধানে থাকবে কিন্তু। মনে রেখ, ইতিহাসের নামে চলে আসা এতদিনের কিম্বদন্তীর ভাব-প্রবণতা এবং আতঙ্কিত গ্রন্থকারদের ঢাক্-ঢাক্-গুড়-গুড়-এর স্রোতকে তোমার দুরূহ এষণা-লব্ধ বাস্তব-তথ্য আর সত্যের খাতে বহাতে সচেষ্ট তুমি। তাই পুরীতে তুমিও আজ আর অজাতশত্রু নও। আমার প্রাণভরা ভালবাসা গ্রহণ কর। ইতি—

তোমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী

প্রভুজী

পুঃ—মাত্র দশটি দিন আর ধৈর্য ধারণ কর।
তার পরেই ত' আমরা পুনর্মিলিত হচ্ছি।